প্রথম প্রকাশ ঃ ১ নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দে
বস্না প্রকাশন
১৪/১ পিয়ারীমোহন রায় রোড
কলিকাতা-২৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রী বেনীমাধব রায়চৌধুরী
লিপি মুদ্রণী,
১৭/২/১, কালিপদ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৮

প্রস্তাবনা

বহু বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। তারই মধ্য থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করে এই সঙ্কলন গ্রন্থে প্রকাশ করা হল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্বাভাবিকভাবে আমার চিন্তায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কোনরকম পরিবর্তন না করেই প্রবন্ধগুলি এখানে পুনরায় মুদ্রণ করা হল। তাই এই গ্রন্থখানি আমার কোন নতুন রচনা নয়। প্রতিটি প্রবন্ধের শেষেই পত্র-পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি প্রবন্ধে রচনাকাল রয়েছে, কিন্তু কোন পত্র-পত্রিকার নাম নেই। তার কারণ রচনাটি বাংলাদেশের 'বিচিত্রা' নামক সাপ্তাহিক কাগজের জন্য লিখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে আর প্রকাশ করার সুযোগ ছিল না। তাই অবিকৃত অবস্থায় প্রবন্ধটি এই গ্রন্থেই প্রকাশিত হল। আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধে একই তথ্যের পুনরুক্তি রয়েছে। তার কারণ হল আমার কয়েকটি বক্তৃতা যেভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সুবিধা হবে মনে করে এই প্রবন্ধগুলিও একইভাবে রেখে দিলাম। একটি মুদ্রণ ত্রুটি সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করছি। 'কোণারকের সূর্য-মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্তিব কারণ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সুপর্ণা' (১৩৬৭ পৌষ) নামক পত্রিকায়।

কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলির অনুলিপি করে মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে হুগলী জেলার হরিপালের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালযের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী বিপ্লব রঞ্জন ঘোষ। আর 'বিচিত্রা'র জন্য লিখিত প্রবন্ধটির অনুলিপি করে দিয়েছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রী অরিজিৎ রায়চৌধুরী। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রী শ্যামল বসু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেও মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করে যথাসময়ে গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের সকলের এই সাহায্য সব সময়ে আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 'রত্না প্রকাশনের' শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দেকে। কারণ তাঁরই আগ্রহে এই সঙ্কলন গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল।

অমলেন্দু দে

সূচীপত্র

হজরত মহম্মদের ভাববাণী ও বাংলা ভাষায় কোরাণ গ্রন্থের অনুবাদ	১
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ধারা	১০
যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী ভাবধারা ও বাংলার নবজাগরণ	২৭
বিপিনচন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলি : মতান্তর ও তিক্ততা	৩১
বাঙালী মুসলিম সমাজ ও একুশে ফেব্রুয়ারি	৬৪
ডঃ সিরাজুল ইসলাম রচিত 'শেরে বাংলার পুনর্মূল্যায়ণ' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে	৭৫
সাঁওতাল বিদ্রোহ	৯৪
নীল চাষের ইতিহাস	১০৭
বাংলায় নীলচাষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৫
আদিবাসী সমস্যা প্রসঙ্গে	১৩৩
অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে	১৫০
আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার অবদান	১৭১
বাঁশবেড়িয়ার মন্দির	১৮০
কোণারকের সূর্যমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ	১৮৭
বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের অবদান	১৯৬

হজরত মহম্মদের ভাববাণী ও বাংলা ভাষায় কোরাণ গ্রন্থের অনুবাদ

বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষ্যে আমার বক্তব্য বিষয় তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব : (ক) হজরত মহম্মদের অহি বা ভাববাণী লাভ এবং পবিত্র কোরাণ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ; (খ) ইসলাম ধর্মের মূল সূত্র ও মহম্মদের বাণীসমূহ ; (গ) বাংলা ভাষায় কোরাণ গ্রন্থ অনুবাদের গুরুত্ব। হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যেই তাঁর ঘটনাবহুল জীবন অতিবাহিত করেন। প্রথম দিকে তাঁকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। এরই মধ্যে দীর্ঘকাল যোগযুক্ত অবস্থায় থেকে তিনি নিজেকে সাধনমার্গের উচ্চ আসনে উন্নীত করেন। অবশেষে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রথমে হীরা পর্বতে অবস্থানকালে অহি বা ভাববাণী লাভ করেন। এই পর্বত ছিল মক্কার নিকটে। আর মরু-পর্বতের হাওয়া ছিল খুবই উত্তপ্ত। তখন থেকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কোরাণের ছোট বড় এক একটি অংশ তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়। হজরত মহম্মদের কয়েকজন সহচর ছিলেন, তাঁদের বলা হত 'কাতেবুল্-অহ্য়' অথবা ভাববাণীর লেখক। যখনই হজরত মহম্মদের নিকট কোন ভাববাণী প্রকাশিত হত তখনই তাঁরা তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এইভাবে কোরাণের বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ হয়। তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় বিভিন্ন চামড়ার টুকরায়, প্রস্তর ও অস্থিখণ্ড প্রভৃতির ওপর। হজরত মহম্মদ নিজে যত্ন করে কোরাণের অংশগুলো তাঁর বাসস্থানে একটি সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রাখেন। এইভাবে কোরাণ হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ হয়। তাছাড়া হজরত

মহম্মদের সহচরেরাও নিজেদের ব্যবহারে জন্য কোরাণের আয়াত ও সুরাগুলি লিখে রাখতেন। সেকালে কোরাণের ত্রিশ খণ্ড কণ্ঠস্থ করে রাখতেন এক ধরনের সাধকেরা, তাঁদের বলা হত হাফেজ বা স্মৃতিধর। তাঁরা খুব যত্ন করে ও বিশুদ্ধভাবে সমগ্র কোরাণ গ্রন্থখানা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন বলে মুসলিম সমাজে তাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আদৃত হতেন। হাফেজ কর্তৃক কণ্ঠস্থ করে রাখার এই যে প্রথা তা হজরত মহম্মদের আমল থেকেই চলে আসছে। হজরত মহম্মদ নিজে ও তাঁর বহু সংখ্যক সাহাবা বা সহচর সম্পূর্ণ কোরাণকে কণ্ঠস্থ করে রাখেন। তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে হাফেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আজ বিভিন্ন দেশে হাফেজের সংখ্যা অনেক। সুতরাং কোরণকে অবিকৃত রাখার বিষয়ে হাফেজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

হজরত মহম্মদের পরে আমরা চারজন ধর্মপ্রাণ খলিফার পরিচয় পাই : আবু বকর (৬৩২-৬৩৪ খ্রী), ওমর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রী), ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খ্রী) ও আলি (৬৫৬-৬৬১ খ্রী)। একটা ধারণা প্রচলিত আছে, আবু বকরের সময় কোরাণ সঙ্কলিত হয়। আবার অনেকে ওসমানকে 'জামেউল-কোরাণ' বা কোরাণ সঙ্কলক উপাধি দান করেন। হয়তো উভয় ধারণার মধ্যে সত্যতা আছে। আবু বকর দক্ষ লিপিকারদের দ্বারা একখণ্ড পুস্তকে যথাযথভাবে কোরাণের অংশগুলোর নকল করে রাখেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের আমলে ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়। তখন তিনি ইসলাম শাসিত বিভিন্ন দেশে সরকারীভাবে সঙ্কলিত কোরাণের কয়েকখানা নকল পাঠিয়ে দেন। এইভাবে কোরাণ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় ও অন্যদেশে যায়। আরবি 'কারা' শব্দ থেকেই 'কোরাণ' শব্দের উদ্ভব। 'কারা' শব্দের অর্থ হল পড়া, আবৃত্তি করা। কোরাণ ১১৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় এর সাত প্রকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, যথা—প্রথম দুখানি মদিনায়, তৃতীয় মক্কায়,

চতুর্থ কুফানগরে, পঞ্চম বসরায়, ষষ্ঠ সিরিয়া দেশে এবং সপ্তম সংস্করণ ভাল ছিল না বলে লেখকেরা স্থানের উল্লেখ করেননি। এই সাতখানি সংস্করণের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে বিশেষ গোলযোগ হয়েছিল। অবশেষে জয়দ নামে মদিনাবাসী পণ্ডিত সংগৃহীত কোরাণ মুসলমানেরা গ্রহণ করেন। জয়দ ছিলেন হজরত মহম্মদের ক্রীতদাস। খদিজা বিবির ও আলির পরেই জয়দ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খলিফা ওসমান জয়দ সংগৃহীত কোরাণ মুসলমানদের মানতে বাধ্য করেন; আর অন্য সমস্ত কোরাণ তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। কোরাণ গ্রন্থ সঙ্কলনের এই হল ইতিহাস।

এবার আমি সংক্ষেপে ইসলাম ধর্মের মূলসূত্র ও হজরত মহম্মদের বাণী সম্পর্কে কিছু বলব। কোরাণ, হাদিস ও সুন্না থেকে এই বিষয়ে আমরা সব তথ্য পাই। ভাববাণী সঙ্কলিত আছে কোরাণে। ধর্মের মূল সূত্রগুলো এখানেই পাওয়া যায়। তাছাড়া মহম্মদের বাণী ও আচার-পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায় হাদিসে ও সুন্নায়। যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তা হল: ঈমান বা কালেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। 'কালেমা'র অর্থ হল 'শব্দ'। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা পূজনীয় নেই; মহম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল। 'নামাজ' হল ফার্সী ও হিন্দুস্থানী শব্দ; এর আরবি প্রতিশব্দ হল 'সালাত'। আল্লার বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নামাজ। 'রোজা' ফার্সী শব্দ; এর আরবি প্রতিশব্দ হল 'সাউম'। রমজান মাসে উপবাস পালন করে নিজেকে অশুভ শক্তির প্রভাবমুক্ত করা। 'জাকাত' শব্দের আদি অর্থ হল পবিত্রতা। তবে সম্পত্তির অংশ দান করা অর্থে তা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যার দেবার মত অর্থ সম্পদ আছে সে তা দান করে পবিত্রতা লাভ করবে। দরিদ্রদের প্রতি অর্থবান ব্যক্তিদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ। হজ করা অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি লাভের উপায়। এই পাঁচটি মূল নীতি ভিত্তি করেই

ইসলামের প্রকাশ।

এখন কোরাণ গ্রন্থ থেকে ভাববাণীর কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে এই পবিত্র গ্রন্থের সারাংশের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব :

আল্লাহ : বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ১ : ১

আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলোস্বরূপ। ২৪ : ৩৫

তাঁর আসন আসমান ও জমিন পরিব্যাপ্ত আছে। ২ : ১৫৫

মহম্মদ (দঃ) : মহম্মদ আল্লার রসুল (দুত)। ৪৮ : ২৯, ৩ : ৪৪

আমি তোমাকে বিশ্বজগতের করুণাস্বরূপ ব্যতীত পাঠাইনি। ২১ : ১০৭

নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী। ১৩ : ৭

মানুষ : মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ২ : ২১৩, ১০ : ১৯

তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। ৪ : ১ ৭ : ১৮৯

কৃতকার্য : যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করে, তাদের সুসংবাদ দান করো, তাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান। ২ : ২৫ ১৮ : ১০৭

নিশ্চয় সফল মনোরথ তিনি, যিনি পবিত্র। ৮৭ : ১৪ ২৩ : ১

ধর্মাবতার : এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন সতর্ককারীর আগমন হয়নি। ৩৫ : ২৫

প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসুল (দূত) প্রেরিত হয়েছে। ১০ : ৪৭

জাতি ও গোত্র : হে মানববৃন্দ, আমি তোমাদের একই পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশ করেছি—যেন তোমরা

পরস্পরকে জানতে পার, নিশ্চয় আল্লার নিকট তোমাদের সংযমশীলতাই সম্মানজনক। ৪৯ : ১৩

হে বিশ্বাসীগণ এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস বিদ্রূপ করো না। ৪৯ : ১১

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, যা তারা পালন করে। ২২ : ৬৭

ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই। ২ : ১৫৬

তারা যাদের (দেবদেবীর) বন্দনা করে, তুমি তাদের (পূজ্য বস্তু সম্বন্ধে) কোন দুর্বাক্য বলো না। ৬ : ১০৮

আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযমী, যারা সৎকর্মশীল। ১৬ : ১২৮

ভাষা : কোন রসুলকে (দূত) তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা-সহ ব্যতীত প্রেরণ করিনি। ১৪ : ৪

এবার কোরাণ ও হাদিস থেকে কয়েকটি আচরণবিধি উল্লেখ করছি : একথা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, যেমন নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ করা 'ফার্জ,' তেমনি 'গুণাহ্' হতে দূরে থাকাও 'ফারজ্'। কতগুলো 'কবীরা গুণাহ্' উল্লেখ করা হল : (১) খোদার সাথে শারীক করা ; (২) নাহাক (অন্যায়রূপে) নরহত্যা করা ; (৩) পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া ; (৪) মদ খাওয়া ; (৫) অত্যাচার করা ; (৬) অসাক্ষাতে অসন্তোষজনক কথা বলা ; (৭) খোদার শাস্তির ভয় না করা ; (৮) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ; (৯) প্রতিবেশী মেয়ে কি স্ত্রীলোকদের প্রতি কুদৃষ্টি করা ; (১০) কোন স্ত্রীলোককে মিথ্যা জেনার দোষী করা ; (১১) সত্য গোপন করা ; (১২) মিথ্যা বলা ; (১৩) চুরি করা ; (১৪) সুদ খাওয়া ; (১৫) অত্যাচারীর তোষামোদ করা ; (১৬) জুয়া খেলা ; (১৭) মাপে কম দেওয়া ; (১৮) অন্যায়রূপে বিচার করা ; (১৯) কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ

আগ্রহের সাথে শোনা ; (২০) অন্যের দোষ অন্বেষণ করা ইত্যাদি।

কোরাণে যে ৩০।৩১ বার 'আস্ সিরাতুল মুসতাকিম্' বা 'সঠিক পথে'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মূল কথাই হল ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে তাঁর উপাসনা করা।

আরব দেশে হজরত মহম্মদ যখন এই ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন তখন সেখানে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও পারিবারিক জীবনে ঘন তমসা বিরাজমান ছিল। ইসলাম ধর্মের আলোকে সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়—জীবনের উজ্জ্বলতর দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়। পৌত্তলিকতার পরিবর্তে 'তৌহীদ' বা একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে ধর্মীয় জীবনের অনেক প্রচলিত কুসংস্কার বিলুপ্ত হয়। সামাজিক জীবনেও প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শিশু হত্যা বন্ধ, সহায় সম্বলহীন শিশুদের রক্ষা, উত্তেজক পানীয় (মদ) নিষিদ্ধ, ক্রীতদাসদের প্রতি সহৃদয় আচরণ, মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি করার ফলে ইসলাম এক নতুন সামাজিক শক্তি ও নীতিবোধ সৃষ্টি করে। এর মঙ্গলময় প্রভাব মানুষের বিষণ্ণতা দূর করে তাকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে।

এই প্রসঙ্গে বহু বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি। হজরত মহম্মদ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণকারীদের চার স্ত্রী গ্রহণের অধিকার স্বীকার করেও যেসব নির্দেশ দেন তাতে আরব দেশের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে আঘাত করা হয়েছে। কোরাণের 'আন্-নিসা' অংশে বলা হয়েছে : "তোমরা বিবিদের প্রতি সমান ব্যবহার কর। যদি তোমাদের নিজ নিজ বিবিগণের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, এরূপ ধারণা হয়, তা হলে কেবল একজন স্ত্রীলোককে পত্নীত্বে গ্রহণ কর।" এমনকি বিবিদের প্রতি গালি-গালাজ দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় পত্নীগণের প্রতি সমান ব্যবহার করা 'ওয়াজেব' ; না করলে পরকালে দায়ী হতে হবে। আমরা যদি সেকালের পটভূমিতে এই চার স্ত্রী গ্রহণের

বিষয়টি আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো বহু স্ত্রী গ্রহণের পরিবেশে এই সীমা বেঁধে দেওয়া মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। সেদিনের সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। সংক্ষেপে এই হল ইসলামের সুফল।

এখানে ইসলাম ধর্মের মূলসূত্র ও হজরত মহম্মদের যেসব বাণী উল্লেখ করা হল তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ইসলামে পরিস্ফুট আধ্যাত্মিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের আবেদন বিশ্বজনীন। একই সুর ও আবেদন আমরা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পাই। আল্লাহ ও ঈশ্বর নামের পার্থক্য থাকলেও একই আধ্যাত্মিক সঙ্গমে অবগাহন করে মানবিক-নৈতিকবোধে উজ্জীবিত করে মানব সমাজ গড়ার প্রয়াস ইসলামের ও অন্য ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় কেশবচন্দ্র সেন সকল ধর্মের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ উপভোগ করে নিজে গভীর তৃপ্তি পেতেন, সহযোগী-দেরও উদ্বুদ্ধ করতেন বিভিন্ন ধর্ম চর্চা করতে। তিনি চারটি প্রধান ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের আলোকে অধ্যয়নের জন্য চারজনকে নির্বাচিত করেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানকে পরস্পরের নিকটতর করে এক নতুন মানব পরিবার গঠন করা। তিনি ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে ইসলাম ধর্ম চর্চা করে, আরবি ভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় কোরাণ অনুবাদ করতে বলেন। তাঁরই নির্দেশে গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে আরবি ভাষা চর্চা করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সেখানে তিনি প্রায় পাঁচ বছর থেকে বিখ্যাত মৌলবীদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। উল্লেখ্য এই যে, অল্প বয়সেই গিরিশচন্দ্র ফারসী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। আরবি ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে ফিরে

গিয়ে আরবি থেকে কোরাণ বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন। একটানা ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি কোরাণ সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। তিনি কোরাণ অনুবাদ করতে কোন মৌলবীর সাহায্য নেননি। তিনি নিজেই শুদ্ধ তফ্‌সিরাদি গ্রন্থের সাহায্যে কোরাণ অনুবাদ করেন। প্রথমে তিনি খণ্ডাকারে কোরাণ মুদ্রিত করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বাংলায় অনূদিত কোরাণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কোরাণের প্রথম খণ্ড বাংলায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। কলকাতা মাদ্রাসার আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিভিন্ন স্থানের মৌলবীবৃন্দ লেখককে সাদর অভিনন্দন জানান। তারপরে ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থ গিরিশচন্দ্র বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করেন। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কোরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদক বাংলায় ইসলাম চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে অজ্ঞতা লোকের ছিল তা তিনি দূর করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র অনূদিত কোরাণের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় মৌলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আকরম খাঁর পিতার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। আকরম খাঁর যখন বালক বয়স তখন তাঁর পিতা দুবার গিরিশচন্দ্রের কাছে পুত্রকে নিয়ে যান। দ্বিতীয় দিনে আকরম খাঁকে দেখে গিরিশচন্দ্র তাঁর পিতাকে বলেন: "আজও দেখছি, খোকাকে সঙ্গে করে এনেছেন।" আকরম খাঁর পিতা হেসে বলেন: "ছেলে মানুষ করা বড় দায় ভাই ছাহেব। তাই কেতাব পড়ানর চাইতে বেশী দরকার মনে করি সৎসঙ্গের।" এই কথোপকথন উল্লেখ করে মোহাম্মাদ আকরম খাঁ "গুরু হিসাবে, অগ্রপথিক হিসাবে এবং সত্যের অবিচল সেবক হিসাবে" ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের প্রতি

অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন: "গিরিশচন্দ্রের সেদিনকার সেই 'খোকা' গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে, তিন কোটি বাঙ্গালী মুছলমানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছে।"

এইভাবে একসময়ে কয়েকজন সাধকের প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম চর্চার মধ্য দিয়ে যে ঔদার্যবোধ বাংলায় বিকশিত হয়েছিল তাকে যদি আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি তাহলে বিশ্বনবী দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো—হজরত মহম্মদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন যথার্থ হবে।

[২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে বিশ্বনবী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই সভার অতিথি-বক্তা হিসেবে যে সুদীর্ঘ ভাষণ আমি দিই তার সংক্ষিপ্তসার 'আল ইমাম' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বিশ্বনবী ও আস সিরাতুল মুসতাকিম,' এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। দ্রঃ 'আল ইমাম' ২৩শে মার্চ, ১৯৭৯, কলিকাতা। এখানে শিরোনামা পরিবর্তন করে রচনাটি প্রকাশ করা হল।]

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ধারা

আধুনিক কালে মুসলিম সমাজে জাগরণের চিহ্নগুলো পরিস্ফুট হয় হিন্দু সমাজের অনেক পরে। কি কারণে মুসলিম সমাজ অনগ্রসর থাকে তার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করে কোন্ পটভূমিতে মুসলিম সমাজে আধুনিক জীবনের লক্ষণসমূহ বিকশিত হয় তার কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকে দ্রুত ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানেরা সহজে মেনে নিতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশ শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রতিফলন পাওয়া যায় ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের (১৮১৮-১৮৭০ খ্রী) মধ্যে। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭-১৮৫৮) পরেই মুসলিম সমাজের এক সচেতন অংশে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়।[১] কোন্ পথে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়। বাংলায় আবদুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করেন। অন্যদিকে মৌলানা মুহম্মদ কাসিম ননৌতভীর পরিচালনায় উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে ইসলাম চর্চার যে কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানকার উদ্যোগী ব্যক্তিরা ধর্মীয় শিক্ষার সাহায্যে সমাজের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন। এই উভয় গ্রুপই ওয়াহাবী-ফরাজীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতায় তাঁদের নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন।

বলতে গেলে, মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণের জন্য এই তিনটি কেন্দ্র প্রথম যুগে সক্রিয় ছিল : কলকাতা (১৮৬৩ খ্রী), আলিগড় (১৮৬৪ খ্রী) ও দেওবন্দ (১৮৬৭ খ্রী)। এই সময়ে আমরা যদি আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রী), স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রী) ও মৌলানা মুহম্মদ কাসিম নানৌতভীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করি তাহলে ওয়াহাবী-ফরাজী-সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালের এই দুটো ধারার ইতিহাস আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।[২]

বাংলায় মুসলিম সমাজে জাগরণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, প্রথম দিকে যে তিনজন ব্যক্তি সমাজের অগ্রগতির জন্য উদ্যোগী হন তাঁরা হলেন : নবাব আমির আলি (১৮১৭-৭৯ খ্রী), আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রী)। নবাব আমির আলি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব কতটা মুসলিম সমাজের ওপর পড়ে তা সুনির্দ্দিষ্ট করে বলার মত তথ্য আমাদের হাতে নেই।[৩] ১৮৫২ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবদুল লতিফ মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে আত্মনিয়োগ করেন। অর্থাৎ হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রী) স্থাপনের পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই বাঙালী মুসলিম সমাজে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষালাভের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।[৪] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফ এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসাতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটি অব ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমির আলিও 'সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা' গঠন করে মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নে অগ্রসর হন।[৫] আর একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বি. এ. পাস করেন এবং প্রথম বাঙালী মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন, যাঁর নাম হল দিলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩), তিনিও অনেক ইংরেজি প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সংস্কার সাধন করে তার উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সভার সহ-সভাপতিও হন।[৬] এঁরা সবাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারের। আবদুল লতিফের নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে, আর সবাই ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দা। অবশ্য তাঁদের সব উদ্যোগ-প্রচেষ্টা কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ছিল।[৭] পরবর্তীকালে ঢাকা শহরেও শিক্ষিত মুসলমানেরা 'ঢাকা ম্যাহোমেডান ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশন' (১৮৮৩ খ্রী) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এইসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনমত গঠন করে সমাজকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করে। আবদুল লতিফ যখন ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা মুসলিম সমাজের উন্নতির চেষ্টা করেন তখন তাঁর কাজে সহায়ক হন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা মৌলানা কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রী)। তিনি ছিলেন জৌনপুরের অধিবাসী। কেরামত আলি মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দেন।[৮] এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই সময়ে মুসলিম সমাজে জাগরণের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা। সুলতানী আমলে এই ভাষায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হলেও, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে মুসলমান লেখকেরা এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মননশীলতাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করতে সহায়তা করেন। বাংলা ভাষাতে কয়েকখানি ধর্ম গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। বাঙালী মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের আচরণবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এই অজ্ঞতা দূর করবার জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে

'জোব্দাতল মসায়েল' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৯] প্রায় একই সময়ে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) রচিত উপন্যাস 'রত্নবতী' (১৮৬৯) এবং দুটো নাটক 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ও 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেনের পরিচালনায় 'আজীবন নেহার' নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।[১০] তখন থেকেই বাংলা ভাষায় ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে চর্চার সূত্রপাত—অর্থাৎ একদিকে ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়াস, আর তারই পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলিম মননকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা। এইসব প্রয়াস মুসলিম সমাজের সামনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে, আর তার ফলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীর আত্ম-জিজ্ঞাসাও সুরু হয়। প্রসঙ্গত মীর মশাররফ হোসেনের ওপর 'গ্রামবার্তার' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদারের ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও লক্ষ্যণীয়।[১১] ১৮৮১-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন একখানি অমূল্য গ্রন্থ সমগ্র বাঙালী সমাজকে, বিশেষকরে বাংলাভাষী মুসলমানদের উপহার দেন। এই সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম মূল আরবি থেকে বাংলায় কোরানের সম্পূর্ণ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অপরিসীম পরিশ্রম করে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম সমাজে সাদরে তাঁর অনূদিত কোরাণ গ্রন্থ গৃহীত হয়।[১২] ১৮৮৫-১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন লিখিত 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থখানাও বাঙালী পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (উপন্যাস, ১৮৯০) ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (রস রচনা, ১৮৯৯) গ্রন্থসমূহে সমাজের মুখোশ উন্মোচিত করেন।[১৩]

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট মুসলমান লেখক হলেন

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯)। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার 'আলীয়া'র সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।[১৪] সংস্কৃত ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর রচনা 'সমাজ ও সংস্কারক' ধারাবাহিক সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয়। এই রচনা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে মুসলিম জগতের রাজনৈতিক পটভূমিতে প্যান ইসলাম মতবাদের প্রচারক সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনী ও কীর্তি আলোচনা করা হয়েছে[১৫] পণ্ডিত মাশহাদী ছিলেন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী। এই গ্রন্থখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গতা ছিল। পণ্ডিত মাশহাদী আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন: 'অগ্নিকুক্কুট' (১৮৯০), 'প্রবন্ধ কৌমুদী' (১৮৯১), 'সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' (১৮৯২), 'সুরিয়া-বিজয়' (বাংলা সন ১৩০২) ইত্যাদি।[১৬] পণ্ডিত মাশহাদী বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রচনাবলী "সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয় সামগ্রী" হিসেবে কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেন।[১৭] পণ্ডিত মাশহাদী আজীবন জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। পণ্ডিত মাশহাদী বিজ্ঞান পরিশীলনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে স্বধর্মনিষ্ঠ থেকেও সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বলেন, আর জাতীয় সংহতিকে 'জনহিত' ও 'দেশমুক্তির' উপায় মনে করেন।[১৮] স্বভাবতই এইসব লেখকদের রচনার ফলে মুসলিম মানসে নানা প্রশ্নের ভীড় জমে। মুসলিম মননকে প্যান ইসলামীয়, জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, উদারনৈতিক, মানবিক, যুক্তিবাদী ইত্যাদি নানা চিন্তা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। আর তাতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুসলিম পত্র-পত্রিকারও মস্তবড় ভূমিকা ছিল। প্রসঙ্গত 'আকবরে এসলামিয়া', 'আহমদী', 'হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনী', 'কোহিনুর', 'হাফেজ', 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর', 'হিতকরী' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৯]

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণে বাংলা ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বাংলায় মুসলিম জাগরণের উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করতে পারি : (ক) ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে এবং সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারা ; (খ) শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতাদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার প্রয়াস ; (গ) খ্রীষ্টান, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের প্রচেষ্টা ; (ঘ) বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলিম মননকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কয়েকজন মুসলিম লেখকের অবদান। সামগ্রিকভাবে এইসব আন্দোলনের ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলিম সমাজে জাগরণ ঘটে। এই উপাদানগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী যেমন মনে হবে, তেমনি প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদানের মধ্যেও অনেক বিরোধী উপাদানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলন গ্রাম বাংলার মুসলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্দীপিত করে। ফরাজী-ওয়াহাবী তত্ত্বেই জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বর প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন, তাঁরা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করেই তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম নির্ভর থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা ছিল তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সম্ভ্রান্ত, উচ্চ বিত্ত এবং নিরক্ষার দরিদ্র মুসলমান-দের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করেন। পশ্চিমের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক-মানবিক চিন্তাদর্শ যাতে করে ইসলামীয় সামাজিক

কাঠামোর কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ খুবই সচেতন ছিলেন। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে এই উভয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট সহায়ক হয়। মুসলিম সমাজে অনেক অ ইসলামীয় বিধি-আচরণ প্রচলিত ছিল। সেগুলোকে পরিহার করে এই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই মুসলিম সমাজকে সংহতি প্রদান করেন। এই কাজটি প্রথমে শুরু করেন ওয়াহাবী ও ফরাজী ধর্ম সংস্কারকেরা। মুসলিম সমাজে জাগরণের ক্ষেত্রে এই সংহতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ায় বাঙালী মুসলমান তাঁর নিজস্ব পৃথক সত্তা সম্পর্কে সচেতন হন। সাহিত্য চর্চাও শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাকে যথেষ্ট সজীব করে তোলে। বাঙালী মুসলমানদের মত একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এখানে যেভাবে জাগরণ ঘটেছে তাকে সমসাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই জাগরণকে একটি সুসঙ্গত ও সুস্থিত পথে পরিচালনা করতে না পারায় এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী অনেক উপাদান ছিল তা ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে ওঠে ; তার ফলে যুক্তিশীল মানবিক উপাদানগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্মনেতাদের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে মানবিক-যুক্তিশীল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রটি নিয়ে অনুসন্ধান করলে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।[২০] উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুস-লিম সমাজে আত্মজিজ্ঞাসু ব্যাক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচনায় মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি বিপরীতধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও, তিনি মুসলিম সমাজের এই নতুন জাগ্রত চেতনাবোধকে প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলে এক বৃহত্তর পটভূমিতে উন্নীত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু

ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে ধর্মীয় নেতারা যেভাবে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বোধকে উজ্জীবিত করেন তার ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহজ ভাবে চলবার পথটি ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হতে থাকে। এই কারণেই মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজিজ্ঞাসা এক সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। গোঁড়া মুসলমানদের নিন্দায় তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়।[২১] প্রসঙ্গত তাঁর 'গোজীবন' (বাংলা ১২৯৫) পুস্তিকা যে বিতর্কের সৃষ্টি করে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তিনি 'গো-কোরবাণী' সম্পর্কে যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তার বিরুদ্ধে পণ্ডিত মাশহাদী 'অগ্নিকুক্কুট' পুস্তিকায় অনেক যুক্তি প্রমাণ হাজির করেন।[২২] এই বিতর্কে মাশহাদী "উগ্র স্বধর্ম প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতি" ব্যক্ত করেন, আর মশাররফ হোসেনের কণ্ঠে "উদার মানবিকতা ও শ্রেয়োবোধ" উচ্চারিত হয়। পণ্ডিত মাশহাদীর রচনায় 'স্বাধীন,' 'অখণ্ড ভারতবর্ষের' রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া গেলেও 'উগ্র স্বধর্ম-প্রীতি' তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতাকে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করে।[২৩] একই কারণে দিলওয়ার হোসেনও মুসলিম সমাজকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করবার জন্য সমাজ সংস্কারের পক্ষে কলম চালনা করে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।[২৪] মীর মশাররফ হোসেন, পণ্ডিত মাশহাদী ও দিলওয়ার হোসেন প্রণীত রচনাবলী, পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ও সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করে মুসলিম জাগরণ ঘটায় মুসলিম মননশীলতা এক ব্যাপক পরিধি নিয়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি। নেতৃবৃন্দের ও লেখকদের অবদানে আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হলেও তা শিক্ষিত মুসলমানের মনকে ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে বিশেষ প্রসারিত করতে পারেনি। এমনকি ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সে বিষয়েও কোন যথার্থ মূল্যায়ণ মুসলমান বুদ্ধিজীবীর রচনায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে যে নতুন মানব সমাজ

গঠনের প্রচেষ্টা কোন কোন সাধকের মধ্যে দেখা যায় তাকেও প্রজ্জ্বলিত করার কোন প্রয়াস মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ও ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না।[২৫] এইসব কারণে মুসলিম সমাজের নবজাগরণের প্রবাহ এক প্রবল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে সমগ্র বাঙালী জীবনকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি।

সূত্র নির্দেশ ও আলোচনা

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য: (ক) বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (কলিকাতা, মে, ১৯৫৪); (খ) Roots of separatism in Nineteenth Century Bengal Calcutta, (November, 1974)

২ ঐ

৩ ঐ

৪ ঐ

৫ ঐ

৬ Delawair Hosaen Ahamed Meerza, Essays on Mohammedan Social Reform, vols. I-II, Calcutta. 1889. আমার ছাত্রী শ্রীমতী সুলতান জাহান আহমদ এই দুই খণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। গবেষকেরা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাবেন।

৭ আবদুল লতিফের নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কলকাতায় তালতলা লেনে থাকতেন। জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি হুগলি জেলার লোক ছিলেন এবং কলকাতায় থাকতেন। দিলওয়ার হোসেন আহমদের নিবাস ছিল হুগলি জেলার বালনান গ্রামে। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। তিনিও কলকাতায় থাকতেন।

৮ আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯ ঐ

১০ মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থাবলী ও আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

১১ মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩।

১২ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, কোর্-আন্ শরীফ, মূল কোর্-আন্ শরীফ হইতে অনুবাদিত; চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃঃ ৭২০।

কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে এক নতুন মানব পরিবার রচনায় উদ্যোগী হন। সকল ধর্মের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ উপভোগ করে তিনি নিজে তৃপ্তিলাভ করেন, আর তাঁর সহযোগীদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম সমন্বয়ের আলোক অধ্যয়নের জন্য চারজন সাধককে নির্বাচিত করেন। ইসলাম ধর্ম অধ্যয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫- ৯১০)। সাত বছর বয়স থেকেই গিরিশচন্দ্র ফার্সী ভাষা শেখেন। তিনি ময়মনসিংহ শহরে মৌলবীর নিকট উচ্চ ফার্সী সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। তিনি উর্দু ভাষাও শেখেন! একই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের চিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের উপযোগী ব্যক্তি। কোরান শরীফ পাঠ করে ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হবার জন্য গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে আরবি ভাষা চর্চা করেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মৌলবীদেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি ময়মনসিংহে এসে কোরাণ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি কোরাণ অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। গিরিশচন্দ্র কোরাণ অনুবাদ করতে কোন মৌলবীর সাহায্য নেননি। তিনি নিজেই শুদ্ধ তফসিরাদি গ্রন্থের সাহায্যে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদিত কোরাণ প্রথমে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেরপুরে 'চারুযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতার 'বিধানযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে (১৮৮৬) এক হাজার কপি ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ, এক হাজার কপি, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'দেবযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ, এক হাজার কপি, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে' মুদ্রিত হয়। চতুর্থ সংস্করণ, এক হাজার কপি, সম্পূর্ণ গ্রন্থ 'নববিধান পাবলিকেশন কমিটির' উদ্যোগে, 'আর্ট প্রেসে' ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

এই অনুবাদের দুই খণ্ড ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখিত এই ধরনের একখানি প্রশংসাপত্র এখানে উদ্ধৃত করছি:

To the author of the Bengali Translation of the Koran, Calcutta.

Revd. Sir.

We the undersigned have most carefully and attentively read

and compared with the original the first two parts of your valuable production, viz., the Bengali translation of the Koran, and our curiosity is not less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a classic language as the Arabic—which varies so widely in its construction from all other languages of the world.

As we are Mahomedans by faith and brith, our best and hearty thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort and the great troubles he has taken to diffuse the deep meaning of our Holy and Sacred religious book, the Koran, to the public.

The version of the Kora1 above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public.

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may be very useful, particularly to the Mahomedans, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudite.

We have honour to be,
Revd. Sir,
Your most obedient servants,
Ahmud Ullam
Late Arabic Senior Scholar
of the Calcuitta Madrassah,
Abdul Ala
Abdul Aziz

Calcutta,
The 2nd March,
1882

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র অনুবাদিত কোরানের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে মোহাম্মাদ আকরম খাঁ যে 'শ্রদ্ধা-নিবেদন' করে মুখবন্ধ লেখেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘ মুখবন্ধের শেষ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছিঃ "ভাই গিরীশচন্দ্র ভক্ত, সাধক ও অসাধারণ তেজোদৃপ্ত কর্ম্মযোগী। তাঁহার গুণ গরিমার

পরিচয় দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নাই, তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমালোচনা করার অবকাশও এক্ষেত্রে নাই। শুনিয়াছি, কোর্-আনের ও অন্যান্য এছলামী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব গিরীশচন্দ্রের উপর ন্যাস্ত করার সময় কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'তোমার জীবন মহাপুরুষ মোহাম্মদের স্পিরিটে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হউক।' তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই প্রার্থনাটী সার্থক হইয়া আছে, এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আজ এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। বাংলার তিন কোটি মুছলমান জনসাধারণকে তাহাদের আল্লার, রছুলের ও কোর্-আনের সহিত পরিচিত করিয়াছেন সর্বপ্রথমে তিনিই। তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার সম্যক ফলেই বাংলার পাঁচ কোটি অধিবাসী কোর্-আন্ শরীফের, এছলাম ধর্ম্মের ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার স্বরূপ সর্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছে। তাই গুরু হিসাবে, অগ্রপথিক হিসাবে এবং সত্যের অবিচল সেবক হিসাবে, তাঁহার প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতেছি।

"আমার বেশ স্মরণ আছে, শৈশবে পিতার সঙ্গে দুইবার গিরীশচন্দ্রের বাসভবনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্দ্র বাবাকে বলিয়াছিলেন—'আজও দেখ্ছি, খোকাকে সঙ্গে করে এনেছেন।' বাবা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'ছেলে মানুষ করা বড় দায় ভাই ছাহেব। তাই কেতাব পড়ানর চাইতে বেশী দরকার মনে করি সৎসঙ্গের।' গিরীশচন্দ্রের সেদিনকার সেই 'খোকা' গুণমুগ্ধভক্ত হিসাবে, তিনকোটি বাঙ্গালী মুছলমানদের পক্ষ হইতে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছে।" (১ নভেম্বর, ১৯৩৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন রচিত ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাবলী এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) প্রবচনাবলী (আরবি হতে অনূদিত), ১৮৮৫ (২) হদিস্ বা মেসকাত্ মসাবিহ [টীকাসহ বাংলা অনুবাদ], ১৮৯২-১৮৯৮ ; (৩) মহাপুরুষ-রচিত ১ম [এব্রাহিম, মুসা, দাউদের জীবনচরিত], ১৮৮২-১৮৮৬ , (৪) মহাপুরুষচরিত ২য় [মোহাম্মদের জীবনচরিত], ১৮৮৫-১৮৮৭ ; (৫) তাপসমালা [৯৬ জন মুসলমান তপস্বীদের জীবন বৃত্তান্ত], ১৮৮০-১৮৯৬ ; (৬) দরবেশী [কিমিয়ায় সাদত প্রভৃতি মূল মোহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হতে সঙ্কলিত, মুসলমান সাধকদের বৈরাগ্যতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর বিশেষ বিবরণ], ১৮৭৮-১৯০১ ; (৭) ধর্ম্ম-বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য [কিমিয়ায় সাদত ও তেজ করতোল আউলিয়া নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হতে সঙ্কলিত], ১৮৭৫ ; (৮) তত্ত্ব-কুসুম [গোলসানে আস্রার নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হতে সঙ্কলিত] ১৮৮১।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাই গিরীশচন্দ্র সেন লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থঃ (১) *হিতোপাখ্যানমালা ১ম [কবি শেখ সাদী প্রণীত গোলেস্তাঁ হতে সঙ্কলিত], ১৮৫৫ ও পরিবর্দ্ধিত ১৮৭৬ ; (২) হিতোপাখ্যানমালা* ২য় [কবি শেখ সাদী প্রণীত বুস্তাঁ হতে সঙ্কলিত], ১৮৭৬ : (৩) হাফেজ ১ম [মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজ প্রণীত দেওয়ান হাফেজ নামক মূল পারস্য গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ], ১৮৭৭ ; (৪) হিতো-পাখ্যানমালা ১ম ও ২য় হতে মনোনীতাংশ ; (৫) নীতিমালা ১ম [কিমিয়ায় সাদতের উর্দু অনুবাদ 'আকসির হেদায়ত' গ্রন্থের অনুবাদ], ১৮৭৭ ; তত্ত্বরত্নমালা [মস্তে কোওয়র ও মৌলবী জালালোদ্দীন রোমী প্রণীত মসনবি মৌলবী রোম নামক মূল পারস্য পুস্তক হতে সঙ্কলিত], ১৮৮২-১৮৮৭।

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ভাই গিরীশ চন্দ্রের গ্রন্থসমূহ এখানে উল্লেখ করা হল ঃ (১) ধর্ম্ম-সাধননীতি [মহাদার্শনিক আবু হামেদ মোহাম্মাদ গজালী বিরচিত কিমিয়ায় সাদতের উর্দু অনুবাদ আকসির হেদায়তের 'তেরা জোল আবেদিন' ও 'মফ্‌হাজোল আবেদিন' গ্রন্থ হতে অনুবাদ ও সঙ্কলন], ১৯০৬ , (২) মহাপুরুষ মোহাম্মাদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম্ম [মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোর্‌-আন্‌, হদিস প্রভৃতি হতে সঙ্কলিত ধর্ম্মের সার সংগ্রহ ও সমালোচনা], ১৯০৬ , (৩) মহালিপি (১-১০) [পরম সাধু মখদুম শরফোদ্দিন আহমদ মনিরী কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মূল শততম পত্রাবলীর ভেতর দশটির বাংলা অনুবাদ], ১৯০৮ : (৪) এমাম হাসান ও হোসয়নের জীবনী [রওজতোশ্‌ শোহদা নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত], ১৯০৯ , (৫) চারিজন ধর্ম্মনেতা [প্রথম চারজন খলিফা সম্বন্ধে], ১৯০৯ ; (৬) চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী [খাদিজা, ফতেমা, আয়েশা ও রাবেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পারস্য গ্রন্থ মেবাজোন নব্‌ওয়ত এবং তেজকরতোল আউলিয়া হতে সঙ্কলিত], ১৯০৯। তাঁর মৃত্যুর পরে আর কেউ ইসলাম ধর্মের চর্চা এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেননি। তিনি যে সমস্ত অমূল্য আরবি, ফার্সী ও উর্দু পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেন ত ও অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর 'হাফেজের' পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে যায়। 'হদিস' গ্রন্থের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রেখে যান তা কেউ আর সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি [দ্রঃ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাই গিরিশ-চন্দ্র সেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠাঃ ১-৩২]

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন রচিত এইসব অমূল্য গ্রন্থাবলী ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম মননের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মিক সেতু-

বন্ধনের এক উজ্জ্বল প্রয়াস বলা চলে। কেশবচন্দ্র ও তার ভাবশিষ্যরাই ছিলেন এই ধারার প্রবর্তক। এই ধারাটি কেন তার সহজ গতি হারিয়ে ফেলল তার বিশ্লেষণ কারও রচনায় পাওয়া যায় না। মুসলিম নবজাগরণের বিষয় আলোচনায় গবেষকেরা গিরিশ-চন্দ্রের রচনাবলীর প্রভাবের কথা আদৌ মনে রাখেন না। এমন কি ইসলাম তত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও তাঁর উল্লেখ করেন না। অথচ বাংলা ভাষায় তাঁর মত আর কেউ তো ইসলাম ধর্ম বিষয়ক এত মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেননি। ভাই গিরিশ চন্দ্র কঠোর সাধনা করে যে ইসলাম তত্ত্বের এক নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন তা নিয়ে গভীর অনুশীলন করলে আমরা সেকালের ঔদার্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণে এই ঔদার্যবোধের ধারাটি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তমান কালের গবেষকদের।

১৩ মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

১৪ আবদুল কাদির (সম্পাদিত), মাশহাদী-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৫০, পৃঃ ৩০৮।

১৫ ঐ, পৃঃ ১-৮৯

১৬ ঐ, পৃঃ ৯১-৩০২

১৭ ঐ, পৃঃ ৭

১৮ ঐ, পৃঃ ৩৩২

১৯ আমার গ্রন্থ 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী' দ্রষ্টব্য এবং আমার প্রবন্ধ 'Role of Bengali Muslim Press in the Growth of Muslim Public opinion in Bengal (1884-1914)'

২০ আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

২১ ঐ

২২ মীর মশাররফ হোসেন, গোজীবন, ২৫ ফাল্গুন, ১২৯৫ (বাংলা সন)। এই পুস্তিকায় মীর মশাররফ খুব নরম ভাষায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে গো-বধ বন্ধ করতে বলায় গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। মীর মশাররফ হোসেন লেখেন: "গো-মাংস না খাইলে মুসলমান থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—একথা কোথাও লেখা নাই।...

"এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না

বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে-দুঃখে সম্পদে-দুর্ভাগ্যে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?···

"গো-কোরবাণী না হইয়া ছাগলও কোরবাণী হইতে পারে। তাহাতেও ধর্মরক্ষা হয়।···"

পণ্ডিত মাশহাদী এইসব কথার উত্তর দেন তাঁর 'অগ্নিকুক্কুট' পুস্তিকায়। তিনি অনেক তথ্যের উল্লেখ করে গো-বধের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। [দ্রঃ আবদুল কাদির (সম্পাদিত) মাশহাদী-রচনাবলী, পৃঃ ২৩৫-৩০২, ৩১৭-৩১৮]

২৩ আবদুল কাদির (সম্পাদিত), মাশহাদী-রচনাবলী, পৃঃ ৩১৮

২৪ Delawar Hosaen Ahamed, op cit.

২৫ আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

[ঐতিহাসিক, ২য় খণ্ড, ১৩৫৬ বাংলা সন, কলিকাতা এবং দামান, ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৬ বাংলা সন, কলিকাতা।]

যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী ভাবধারা ও বাংলার নবজাগরণ

'বাংলার নবজাগরণ' নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনেকের রচনা থেকে মনে হবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আমরা আসতে পেরেছি এবং ইংরেজি শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলেই বাংলার এই জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে। তা না হলে এই জাগরণ সম্ভব হত না। তাঁদের মতে, পলাশীর যুদ্ধের পরেই প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোর অবসান এবং আধুনিক যুগের অভ্যুদয় হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে স্বভাবতই মনে হবে ভারতের জীবনধারায় এমন কোন উপকরণ ছিল না যা আধুনিক জীবনের পত্তন ঘটাতে পারে। আর এই ধারণাও হবে ইংরেজরা না এলে আমাদের পক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসা সম্ভব হত না। এখন দেখা যাক, এই দৃষ্টিভঙ্গী কতটা তথ্য-নির্ভর। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, কোন দেশের মানুষের ইতিহাসই একটি বদ্ধ-জলাতে আবদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক কারণে কোন জাতি অগ্রসর, আর কোন জাতি অনগ্রসর হয়। অতএব প্রত্যেক জাতির মধ্যেই পরস্পর বিরোধী আদর্শের ও চিন্তার সংগ্রাম তরঙ্গমালার ও প্রবাহের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে তার ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে। সমাজের অগ্রগমনে তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে নানা চড়াই-উৎড়াই ভেঙে ভারতের জীবনধারার যে রূপায়ণ ঘটেছে তাতে রক্ষণশীলতার পাশাপাশি যুক্তিশীলতা-মানবতাবোধ অবস্থান করেছে। তাদের মধ্যে নানা পর্বে নানা সংঘাত ঘটেছে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম ইত্যাদির প্রভাব ও

প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেই তা আমরা বুঝতে পারি। সম্রাট অশোকের ও আরও অনেকের শাসনকালে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আর প্রাচীনকালের জীবনধারার সঙ্গে বহির্জগতেরও পরিচিতি ঘটে। বাণিজ্য সম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তারও লেন-দেন হয়। এমনি করেই প্রাচীনকালে ভারতীয় মানস গড়ে ওঠে।

অষ্টম শতকের শুরুতে ভারতবর্ষ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে পারস্য-তুর্কিদের দিল্লিতে প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে একটি নতুন সংস্কৃতি, নতুন জীবন পদ্ধতি, নতুন ধর্ম, নতুন শিল্প ও স্থাপত্যরীতি স্থায়ীভাবে তার আসন করে নেয়। পারস্য-তুর্কী, মুগল ও অন্যান্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এখানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অতীতের দ্রাবিড় ও আর্যদের মত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও এদেশের মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশের ফলে ক্রমান্বয়ে বিরোধ, বিনিময় ও সমন্বয় এক ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এক মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, যাকে প্রকৃত-পক্ষে ভারতীয় হিন্দু-ইসলামীয় সংস্কৃতি বলা চলে। এক ভিন্নতর পরিবেশে ইসলামীয় সংস্কৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি হিন্দু-সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ হিন্দু বা বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলাম এইভাবে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। মধ্য যুগের ভারতে ‘সুফী’ মতের ইসলামে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ইসলামীয় সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন বা বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য তার সুন্দর প্রকাশ ঘটে। সুফী মতের ইসলামে যে উদার ও সর্বজনীন আদর্শ ছিল তার সঙ্গে ‘হিন্দু দর্শনের ও হিন্দুর উচ্চাঙ্গের ধর্মজীবনের, সহজ অবস্থানের ও আপোসের পথে কোন অন্তরায় ছিল না। শরিয়তী বা গোঁড়া ইসলামের অথবা গোঁড়া হিন্দুধর্মের পাশাপাশি একটি উদার ও সর্বজনীন জীবনধারার তরঙ্গ প্রবহমান হয়। এই ভাবধারাকে প্রবহমান রাখার ব্যাপারে মধ্যযুগের অসংখ্য সাধকের

ও কয়েকজন শাসকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি সন্তগণের কথা তো সকলেরই জানা আছে। উদার ভাবধারার ও বিশ্বমৈত্রীর প্রচারক হিসেবে খ্যাতিমান শাসকদের ও যুবরাজদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাশ্মীরের জৈনুল আবেদীন, সম্রাট আকবর এবং রাজকুমার দারা শিকোহ।

অনেককাল আগেই আরবি ভাষায় গ্রীক গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। নবম শতকের প্রারম্ভে মুসলমানেরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গেও পরিচিত হন। এই সময়ে বাগদাদে যে বিখ্যাত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তীকালে ফারসি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এই পথেই সপ্তদশ শতকে ফারসি ভাষায় দারাশিকোহ কর্তৃক অনূদিত উপনিষদ্ ইউরোপে চলে যায় এবং এই গ্রন্থখানি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি-ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে দুই-খণ্ডে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত যে সব আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিকাশ ঘটে উদারনৈতিক-মানবতাবাদী ভাবধারা প্রসারে তাদেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগের ধর্ম-সমাজ সংস্কারকেরা প্রধানত এই সব কথ্য ভাষার মাধ্যমে তাঁদের সংস্কার মুখী চিন্তাধারা প্রচার করেন। এই সময়ে অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। ভূমি ব্যবস্থায়, শিল্পে, ব্যবসা বাণিজ্যে ও কারিগরী ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু উপকরণ বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এইভাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যখন ধীর মন্থর গতিতে আধুনিক জীবনের উপকরণসমূহ বিকশিত হতে থাকে তখন মুজাদ্দিদিয়া রিভাইভ্যালিষ্ট আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে সাংস্কৃতিক জীবনের সমন্বয়ের এবং উদারনৈতিক মানবতাবাদী ভাব

ধারার ওপরে আঘাত হানে। এই রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ঔরঙ্গজেবের মত এক শক্তিশালী সম্রাটের সমর্থন লাভ করেন। স্বভাবতই উদারনৈতিক-মানবতাবাদী ভাবধারার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই সময়ে রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারনীতির বিরোধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রক্ষণশীল শক্তি সাময়িক-ভাবে সাফল্যলাভ করলেও উদারনৈতিক ভাবধারাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই অষ্টাদশ শতকের অন্ধকারময় দিনগুলোতেও অসংখ্য সাধকের আবির্ভাব, যাঁরা উদার-নৈতিক-মানবতাবাদী ভাবধারাকে প্রজ্বলিত রাখেন।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ক্রমান্বয়ে ভারতের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত এবং উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার ফলে ভারতের পক্ষে সুসংহত জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে নিজেদের স্বাধিকার বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। এক পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির নানা ভাবধারা এসে মিশতে থাকে। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের সৃষ্ট ও তার ওপরে নির্ভরশীল শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তায় ও কর্মে এক রূপান্তর ঘটে। একেই 'নবজাগরণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই নবচেতনার সঙ্গে ব্যাপক জনসাধারণের কোনই সংযোগ ছিল না। এই জাগরণ কেবলমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই বা ব্রাহ্মরাই ছিলেন প্রধান অংশ। ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে। তাই হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিকাশ অসমান ছিল। শিক্ষিত হিন্দুদের অনেক পরে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের পত্তন ঘটে। এই অসমান বিকাশের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক জটিলরূপ ধারণ করে। যার প্রভাব উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করা

যায়। সুতরাং উনবিংশ শতকের জাগরণের ঢেউ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৃহত্তর মুসলিম জনসমষ্টিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি।

সাহিত্যে, সমাজে ও রাজনীতিতে নবজাগরণের উদ্যোক্তাদের অবদান স্বীকার করেও আর একটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েও ধর্মের নানা আনুসঙ্গিক উপকরণ থেকে, যা প্রতিনিয়ত উদারনীতি-মানবতাবাদী ভাবধারাকে প্রতিহত করে, নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি ; এবং ভারতীয় জীবনধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে উদারনীতি-মানবতাবাদী ভাবধারা ছিল তার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের চিন্তাধারার সংযোগ স্থাপন করে ধর্মের গণ্ডীর বাইরে এক ভারতীয় জীবনবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারেননি। তাই ধর্ম মিশ্রিত বাংলার নবজাগরণ এক যুক্তিধর্মী-মানবধর্মী নতুন চেতনার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তাই বাংলার নবজাগরণের এক খণ্ডিত রূপ আমরা পাই।

আর একটি বিষয়ের প্রতিও গবেষকদের দৃষ্টি এখনও ততটা নিবদ্ধ হয়নি। রামমোহনের চিন্তায় ও কর্মে আমরা যে যুক্তিবাদী মানবতাবাদী উপাদান পাই তাকে উনবিংশ শতকের আধুনিক জীবনের সূত্রপাত, একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেও নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনায় যুবরাজ দারা শিকোহ-র চিন্তার ও আদর্শের সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। দারা শিকোহ ও রামমোহন —এই দুই ব্যক্তিত্বের অবদান বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উনবিংশ শতকে নবজাগরণে যে আধুনিক মানুষের পরিচয় আমরা পাই সেই মাপকাঠিতে দারা শিকোহ ছিলেন আধুনিক মানুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন যুগে এই দুই মহান চরিত্র জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের মধ্যে চিন্তায় ও আদর্শে অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই যোগসূত্রটি নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাই

বাংলার নবজাগরণ আলোচনায় কেবলমাত্র রামমোহনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকবে।

মনে রাখা দরকার, যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী ভাবধারায় উনবিংশ শতকের বাঙালী মানস সঞ্জীবিত করতে না পারায় বাংলার নব-জাগরণের উদ্গোক্তারা জাতীয় সংহতির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হননি। ইউরোপের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই সামন্ততন্ত্রের জঠরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারফলে অর্থনৈতিক জীবনে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে। প্রায় একই সময়ে যুক্তিবাদী ভাবধারা চিন্তার রাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। দেশের মাটির গভীরে এর শিকড় ছিল বলেই ইউরোপের জাগরণ বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় রূপ ধারণ করে। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকায় তাঁদের পক্ষে গোটা জাতির মনকে আন্দোলিত করা সম্ভব হয়নি। তাই এই কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে পাওয়া যায় না।

এই সব সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে আমাদের জীবনে বাংলার নবজাগরণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে।

বিপিনচন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলি ঃ মতান্তর ও তিক্ততা

'দি ইংলিশম্যান' ও 'দি কমরেড' পত্রিকার পুরাণো ফাইল থেকে বিপিনচন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলির যে-সব প্রবন্ধ আমি সংগ্রহ করেছি, তা থেকে এই দুই নেতার মতান্তর ও তিক্ততার কারণ এখানে আলোচনা করা হল। এই বিষয়ে কোন আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর শহরে কংগ্রেস অধিবেশনে এই দুই নেতার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি বেতুল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা এই অধিবেশনে আসেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ মহম্মদ আলির রচনায় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তাশীল রচনার জন্য ও একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তারূপে বিপিনচন্দ্র পালের নাম অনেকদিন থেকেই মহম্মদ আলির কাছে পরিচিত ছিল। আর মহম্মদ আলিও একজন প্রভাবশালী নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত। বিপিন পাল অমৃতসরে তাঁকে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। সেখানে দুজনে একসঙ্গে চলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লোকমান্য তিলক ও দেশবন্ধু দাসের যোগসূত্ররূপে তাঁরা দুজনে সক্রিয় ভাবে এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।[১] এই সময়ে মহম্মদ আলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিপিন পালের 'মুসলিম-বিরোধী' প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মহম্মদ আলির মনে হয়েছে যে, বিপিন পালের মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁর ইউরোপ ও সেখানকার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কি করে Super-nationalism of Islam সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের মতই বিকৃত ব্যাখ্যা

করেন? এই প্রশ্নে বিপিন পাল বেশ বিব্রত হন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বলেন, ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এই ধরণের মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাই এই বিষয় নিয়ে মহম্মদ আলিকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। অবশ্য মহম্মদ আলি এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নি।[২] আর তাঁদের মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। এক মাসের মধ্যেই মহম্মদ আলি ভারতীয় খিলাফত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করেন। তুর্কি সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনের জন্য লয়েড জর্জের কাছে এই প্রতিনিধিবৃন্দ দাবী-পত্র পেশ করেন। অবশ্য তাতে ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয় নি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের স্পেশ্যাল অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং মৌলানা শৌকত আলি ও খিলাফত কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় 'অসহযোগ' বিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন মহাত্মা গান্ধীর যাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু দাস, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, মালবিয়া, জিন্না ও আরও অনেকে। এই অধিবেশনের পরেই মহম্মদ আলি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।[৩]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের নিয়মিত অধিবেশন বসে। এখানেই কলকাতার স্পেশ্যাল অধিবেশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে হয়। দেশবন্ধু দাস মত পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধীর সংগে যোগ দেন। তাই নাগপুর অধিবেশনে এই সব প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়। হঠাৎ দেশবন্ধু দাসের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই হতভম্ব হয়ে পড়েন। মহম্মদ আলির প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, এই সময়ে গান্ধী-দাস মৈত্রীর পেছনে তাঁরও কিছুটা অবদান ছিল। উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় তাঁকে বিশেষ দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৪] যে কয়জন মুষ্টিমেয় সদস্য নাগপুর অধিবেশনে 'অসহযোগ' সম্পর্কীয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন

তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মালবিয়া, অ্যানি বেশান্ত, জিন্না ও বিপিন পাল। মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন করায় দেশবন্ধু দাসের বিরুদ্ধে বিপিন চন্দ্র পাল ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তিনি একটানা কয়েক বছর ধরে (১৯২০-২৫) অনেক প্রবন্ধে দেশবন্ধু দাসের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন। তখন থেকেই দেশবন্ধু দাস ও বিপিন পাল ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। দেশবন্ধু দাসের বিরুদ্ধে বিপিন পালের রচনা 'ইংলিশম্যান' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫] এই কাগজটি সরকার পক্ষের মুখপত্র ও কংগ্রেস-বিরোধী ছিল। কলকাতার ৯নং হেয়ার স্ট্রীট থেকে এই দৈনিক কাগজ প্রকাশিত হত। এই কাগজে প্রকাশিত রচনাবলী থেকে বিপিন পালের তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর বিপিন পাল যেসব মন্তব্য করেন তাতেই মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক ও তিক্ততার সূত্রপাত হয়। তাই প্রথমেই বিপিন পালের বক্তব্য বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। তিনি 'ইংলিশম্যান' কাগজে 'ভারতীয়ের চোখে' (Through Indian Eyes) এই শিরোনামায় প্রবন্ধ লেখেন। দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর খবরে মহাত্মা গান্ধী গভীর বেদনা অনুভব করেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুতে বাংলা দেশ বিধবার রূপ ধারণ করেছে। দেশবন্ধুকে তিনি অনেক যুদ্ধের বীর বলে সম্মানিত করেন। তাঁর মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গবোধ করেন।[৬] এই শোক-বার্তায় গভীর বেদনার প্রকাশ থাকলেও বিপিন পাল তাতে খুশি হতে পারেন নি। তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে জাতীয় আন্দোলনে দেশবন্ধু দাস ও মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা করেন।[৭] এই প্রবন্ধে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বিপিন পাল লেখেন, দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দলের

নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তৎপর হন। অন্য প্রদেশে একাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলেও বাংলা দেশ দেশবন্ধুর শূন্য আসনে মহাত্মা গান্ধীকে বসাতে সম্মত হবে না। তিনি একজন ঋষি হতে পারেন। হয়তো বহুলোকের কাছে তাঁর প্রভাব ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবুও সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে দেশবন্ধু দাস মহাত্মা গান্ধী থেকে শুধু পৃথক নন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর তুলনায় অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। মহাত্মার মত 'নিষ্প্রভ' ব্যক্তির পক্ষে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি দেশবন্ধু দাসের মত আত্মত্যাগীও নন। এই মহান আত্মত্যাগের জন্যই দেশবন্ধুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতি বাঙ্গালীরা এতটা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। আবেগ প্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এই 'নিরুত্তাপ ঋষি' কোনই সাড়া জাগাতে পারবেন না। কেবলমাত্র দেশবন্ধুর জন্যই মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনে স্থান পেয়েছেন। আর বাংলাদেশে গান্ধী আরাধনার প্রবর্তকও ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর বিদ্রোহের সংগে সংগে 'অসহযোগ আন্দোলনে' বাংলাদেশের সমর্থন লাভে মহাত্মা গান্ধী বঞ্চিত হন। তারপর তিনি দেশবন্ধুকে অবলম্বন করেই এখানে তাঁর প্রভাব বজায় রাখতে তৎপর হন। দেশবন্ধুর অবর্তমানে স্বরাজ্য দলের সদস্যরা যদি নিজেদের অসহায় মনে করেন এবং মহাত্মার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তবে এই দলের পুনর্জীবন ও পুনর্গঠন তো হবেই না, তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য।[৮]

তারপর বিপিন পাল বলেন, বাংলা দেশ কখনই গান্ধী মতবাদকে গ্রহণ করেনি। পুরানো ও পরিচিত 'বয়কট' আন্দোলনরূপেই অসহযোগ আন্দোলনকে বাঙ্গালীরা মনে করেন। একেবারেই প্রতিরোধ না করার নীতি বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মনোভাবের সংগে খাপ খায় না। আত্মা সম্পর্কে গীতার

তত্ত্বকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশে 'বোমা' ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা হয়। আত্মা যেমন কাউকে বধ করতে পারে না, তেমনি আত্মার বিনাশও নেই। গীতার মূল কথাই হল তাই। মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত অহিংসা নীতির সংগে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের কোনই যোগ নেই। ঈশ্বর কি তাঁর জীবকে হত্যা করেন না? কিন্তু কোন ক্রোধ বা ঘৃণার বশে ঈশ্বর বিনাশ করেন না, ভালোবাসার বশে, ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে নয়, রক্ষার জন্য। হিন্দুধর্মে মানবাকারে আবির্ভাবের তত্ত্বে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস, যারা প্রতিশোধকামী ঈশ্বরের হাতে নিহত হয় তারা সোজা চিরশান্তির রাজ্যে চলে যায়।[৯]

কেন বাঙ্গালীরা অহিংসা নীতির বিরোধী তা ব্যাখ্যা করে বিপিন পাল মন্তব্য করেন, সার্বজনীন হিন্দু-বিশ্বাসের সংগে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার কোনই মিল নেই। তাঁর মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরোধী। বাংলার বিপ্লবীরা এই নীতিকে মেনে নেননি। এমন কি বাংলার মডারেটরাও রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণভাবে অহিংসানীতিকে গ্রহণ করেননি। হিংসা পাপ, কারণ এর সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। বিপ্লবের মতই, ব্যর্থ বিপ্লবী চিন্তাধারা অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু যদি তা সফল হয়, তবে তা আর অপরাধ হবে না, গুণরূপে গৃহীত হবে।

বাংলার মডারেটরা বিপ্লবীদের নিন্দা করলেও একথা স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাকারীরাই মিণ্টো-মর্লে সংস্কারের পথ সুগম করেন। সুতরাং বাংলা দেশের রাজনীতিবিদেরা—মডারেট ও চরমপন্থী—মনোভাবের দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির বিরোধী ছিলেন। যদি মহাত্মা গান্ধী 'দেশবন্ধুর গদি' দখল করতে সফলকাম হন তবে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই বাংলাদেশের কর্তব্য হল সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বাংলার রাজনীতিতে 'আসন্ন বিদেশী আক্রমণ' প্রতিরোধ করা।[১০] এখানে

'বিদেশী আক্রমণ' বলতে বাংলা দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রাধান্য স্থাপনের কথাই বিপিন পাল উল্লেখ করেন।

আর একটি প্রবন্ধে (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই লিখিত) বিপিন পাল রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১১] বিপিন পালের মতে, বর্তমান জাতীয় রাজনীতির অনিষ্টের মূল হল স্বচ্ছ চিন্তাধারার অভাব। সম্প্রতি অরবিন্দ ঘোষও একথা বলেন। গত পাঁচ বছরে ইচ্ছাকৃতভাবে 'চিন্তাকে' বিনাশ করা হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন মত ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল 'স্বরাজ' অর্জন করা। কিন্তু মহাত্মা এই 'স্বরাজের' কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নি। তিনি কাউকে তা করতে দেন নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে মহম্মদ আলির সংগে আলাপ-আলোচনার সময় বিপিন পাল জানতে পারেন যে, 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ এই কারণে করা হয়নি, যে-মুহূর্তে তা করার চেষ্টা হবে তখনই কংগ্রেসের ঐক্য ভেঙ্গে পড়বে। নাগপুর সম্মেলনে বিপিন পাল গান্ধীর প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে তিনি 'স্বরাজ' শব্দের আগে 'গণতান্ত্রিক' শব্দ জুড়ে দিতে চান এবং ইংরেজিতে তার অর্থ করেন 'পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার' (full responsible government)। দেশবন্ধু দাস তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। সেই সময়ে তিনি বুঝতে পারেন ভারতীয় রাজনীতির ক্লান্তিকর হতবুদ্ধিতা। একজন প্রখ্যাত 'অসহযোগপন্থী' নেতা তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, বর্তমান বিদেশী আধিপত্যের পরিবর্তে প্রয়োজন হলে রণজিৎ সিংহের মত একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসককেও তাঁরা সংবর্ধনা জানাবেন। নাগপুর অধিবেশনে এই ভাষণ অভিনন্দিত হয়। তাই

বিপিন পাল মন্তব্য করেন, যাঁরা 'পৈশাচিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে' (Satanic British Empire) ধ্বংস করতে চান তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন এই ভাষণ থেকেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।[১২]

বিপিন পালের মনে হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়নি। সমগ্র অসহযোগ আন্দোলনকে যেভাবে অসচ্ছ চিন্তাধারার আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়েছে তা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মত চতুর রাজনীতিবিদেরা উপলব্ধি করতে পারেননি, তা তাঁর মনে হয়নি। তাঁর মতে, আলি ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ সরকারের ধ্বংসসাধনেই কেবলমাত্র আগ্রহশীল। ভবিষ্যত নিজের পথ করে চলবে। অবশ্য তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা কখনই গোপনীয়তা অবলম্বন করেননি। তাঁদের আদর্শ রাজনৈতিক নয়, মূলতঃ Theocratic। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী রাজ্যশাসন করাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'জাতীয়তাবাদী' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে কোন মতেই 'জাতীয়তাবাদী' বলা চলে না। কারণ প্রথমে তাঁরা হলেন মুসলমান, পরে ভারতীয়। তাঁদের দেশপ্রেম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, extra-territorial, অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোর চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সংগে সম্পৃক্ত। 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম' শব্দ দুটোর যে নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় তা খুবই অস্বাভাবিক। এ শুধু ইতিহাস অগ্রাহ্য করা নয়, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ অবমাননা করাও। তাই বিপিণ পাল বলেন, জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল দেশপ্রেম (extra-territorial patriotism) পরস্পর একসংগে চলতে পারে না। এই extra-territorial patriotism থেকে প্যান ইসলাম মতবাদের (Pan Islamism) উদ্ভব। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল এককালের সমৃদ্ধশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের যা কিছু সামান্য অবশিষ্ট আছে তা সংরক্ষণ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেই এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং তাঁদের দেশপ্রেম জাতীয়তা-বিরোধী।[১৩] স্বভাবতই ভারতীয় প্যান ইসলামিস্টরা ভারতের রাজনৈতিক গোলযোগের আশু ও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে মোটেই অ গ্রহশীল নন। ব্রিটিশ রাজমুকুটের অধীনে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনেও তাঁদের কোন উৎসাহ নেই। আলি ভ্রাতৃদ্বয় আশা পোষণ করেন, এইভাবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকলে সমগ্র দেশে বিপ্লব দেখা দেবে তখন তাঁদের সুযোগ হবে ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন করার। ইংরেজ শাসন থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হলে তাঁদের স্বপ্ন সফল হবে। ভারতবর্ষে তখন নতুন খলিফার বিজয় পতাকা উড়বে।[১৪]

বিপিন পাল বলেন যে, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রচারের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এই মতবাদের পরিণতির দিকে চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। তাঁদের মনে সন্দেহ হবে একথা ভেবে যে, বিশেষ অভিসন্ধি থাকার ফলে 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হয়। এই কারণে জনসাধারণের ধ্যানধারণার একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা দরকার। একথা মনে রাখা দরকার ব্রিটিশ সমরানুরাগী ব্যক্তি ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা ছাড়াও ভারতবর্ষে এমন ধরণের ব্যক্তিরাও আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী। তাঁরা ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ জিইয়ে রাখতে চান। স্বভাবতই তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শের বিশদ বিশ্লেষণের পক্ষপাতী নন। কারণ ভারতের রাজনৈতিক কর্মীরা যদি একবার 'স্বরাজ' শব্দটি জনসাধারণের প্রয়োজনে জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার (Government of the people, by the people and for the people) এই অর্থে বুঝে ফেলেন তবে তাঁরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের শোষণ ও প্যান ইসলা-

মিস্টদের প্রতি যে বিমুখ হবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৫]

বিপিন পাল এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান ভারতের প্রকৃত সমস্যা জানতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ এখনও অনুভূতির পর্যায়ে (stage of intellection) আছে। অসংখ্য মানুষ কাজের (action) কথা বলেন। তাঁরা এখন 'ব্যবহারিক ও গঠনমলক কার্যক্রমের' (practical programme and constructive programme) দাবী করেন। কিন্তু তাঁরা একথা চিন্তা করেন না, আমরা কি গড়তে যাচ্ছি বা গঠন করব, এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা ফলপ্রসু হবে না। এজন্য 'স্বরাজের' সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্তমানে সংগঠন (organisation) গড়ে তোলার দাবীকে মস্তবড় গঠনমূলক কাজ বলে গন্য করা হচ্ছে। বিপিন পাল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কি উদ্দেশ্যে আমরা সংগঠিত হব, এ বিষয়ে কোন স্বচ্ছ ধারণা কি আমাদের আছে ? বলা হয়, বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য মজবুত-সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। স্বরাজ্য পার্টির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় আইন সভাকে নিক্রিয় করে দেওয়া। কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দ ও অনুগামীরা কখনই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি যে, বর্তমান শাসনযন্ত্র অকার্যকরী হলে তার পরিবর্তে অন্য কি ব্যবস্থা হবে, অথবা আইনসভার শক্তি নষ্ট করলেই কি আমরা 'স্বরাজ' অর্জন করতে পারব। এ সব প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে বিপিন পাল সিদ্ধান্ত করেন, মূল সমস্যা সম্পর্কে কারও চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন নয়; তাই তাঁর মতে, এই অবস্থায় বর্তমানে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সংগঠনের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন হল শিক্ষার এবং রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাধারা প্রচারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের। এ পথেই 'স্বর্গীয় গণতন্ত্রের' (Divine Democracy) প্রাচীন ভাবধারাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা সম্ভব।[১৬]

মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা উল্লেখ না করা হলেও, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাস' (a Self-governing Dominion Status) অর্থে 'স্বরাজ' শব্দের প্রচলন হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বরাজের দাবী করা হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতার' অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। এমন কি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দেশবন্ধু দাস যে-বিবৃতি দেন তাতেও এর উল্লেখ এভাবেই আছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বরদৌলির সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটি অংশ, বিশেষ করে দেশবন্ধু দাস ও মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধীর নীতির সমালোচনা করেন। এই মত পার্থক্যের পরিণতি হল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা। এই পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ও আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য এই পার্টি কংগ্রেসের মধ্যেই থাকে, আর কংগ্রেসের 'অহিংস অসহযোগ' নীতি সমর্থন করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'স্বরাজ' অর্জন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখ করা দরকার, দেশবন্ধু দাস ও মতিলাল নেহরু 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দাবী করলেও, তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে একটা অংশ 'পূর্ণ-সার্বভৌম-স্বাধীনতা'র (Absolute Sovereign Independence) দাবীকে পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে ঘোষণা করতে চান। এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মতিলাল নেহরু একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' দাবী হল তাঁদের পার্টির 'আশু' (immediate) উদ্দেশ্য। এই 'আশু' (immediate) শব্দ যোগ করে তিনি অনুগামীদের শান্ত করেন। বিতর্ক অবসানের প্রয়োজনেই এই শব্দটি যুক্ত করা হয়।[১৭] এই শব্দটি গ্রহণ করায় বিপিন পাল দুর্ভাবনা প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে এই শব্দটি অশুভ বলেই মনে হয়েছে। কারণ 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন

স্টেটাস' অর্জনের পর ব্রিটিশ কমনওয়েলথের জাতিসমূহের মধ্যে সমান অধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের শক্তি সংহত না করে ভারতীয়রা এর বাইরে চলে যাবার জন্য তৎপর হবে। এই প্রস্তাবের অর্থ হল তাই। বিপিন পাল লেখেন, এই মনোভাব প্রকাশ করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই সমান অধিকার ও সম্মানজনক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে আগ্রহান্বিত হবে না।[১৮] এই অবস্থায় এই অশুভ বিশেষণটি (অর্থাৎ আশু বা immediate শব্দ) স্বরাজ্য পার্টির প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়া উচিত। তা না হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে না। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সাথে ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা উচিত যে, তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে যাবেন যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসন ও আত্মোন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।[১৯] এই পথ অনুসরণ করলে স্বরাজ্য পার্টির সাথে জাতীয়তাবাদী গ্রুপ, লিবারেল ও ইণ্ডিপেনডেণ্টদের মৈত্রী স্থাপিত হবে। তা না হলে, তাঁদের সঙ্গে কেবলমাত্র মৌলানা হাসরাত মোহানীর অনুগামী অথবা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সংযোগ থাকবে [২০]

প্রশ্ন হল, কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে দায়িত্বশীল সরকার ভারতবর্ষে স্থাপন করা যাবে? বিপিন পাল এই সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেন। তাঁর মতে, দায়িত্বশীল সরকার হল নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়িত্বশীল আইনসভা কর্তৃক পরিচালিত সরকার। তাদের অপসারণ করবার ক্ষমতাও থাকবে এই নির্বাচকমণ্ডলীর। যে 'স্বরাজে'র কথা ভাবা হচ্ছে তার ভিত্তি হবে এই নির্বাচকমণ্ডলী। পরবর্তীকালে এই নির্বাচকমণ্ডলী সার্বজনীন ভোটা-

ধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। অবশ্য এখনই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তবুও এই অধিকার অর্জন করাই হবে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।[২১] একথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশ এখনও উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী হয়নি। তাই বর্তমানে অবিলম্বে 'স্বরাজ' অর্জনের পথে এই চূড়ান্ত উদ্দেশের কথা মনে রাখতে হবে। এখনই আমাদের যা প্রয়োজন তা এই নয় যে, বিদেশী শাসনের পরিবর্তে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা দরকার যার ফলে ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়, কোন শ্রেণী বা গ্রুপ যেন ক্ষমতা দখল করতে না পারে। একথা পরিষ্কার করে উপলব্ধি করলে বর্তমান আমলাতন্ত্রের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে, ষড়যন্ত্র করে বা প্রতারণা করে, সৎ বা অসৎ পথে, ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রয়োজন হবে না। ধৈর্যসহকারে পরিশ্রম করে জনসাধারণকে শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবার জন্য প্রস্তুত করাই হবে প্রধান কাজ। 'শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী' (educated constituency) ছাড়া কখনই প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। তাঁরাই কেবলমাত্র সচেতনভাবে ভোট দিতে সক্ষম এবং সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। তাই বিপিন পাল 'শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর' প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[২২]

একথাও তিনি বলেন, যতই আমরা বিদেশী শাসনের জন্য অধৈর্য হই না কেন, একথা কি আমরা বলতে পারি বর্তমান ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী দায়িত্বশীল সরকারের গুরুদায়িত্ব বহন করতে সক্ষম? জনসাধারণের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত নন। এই অবস্থায় প্রথমে জনসাধারণকে গ্রামীণ শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানো দরকার। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে

স্বায়ত্বশাসিত গ্রাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই অ্যানি বেশান্ত 'ইণ্ডিয়া বিল' নামক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান। কিন্তু এই অজুহাতে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় যে, গ্রামের কাউন্সিলে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণরা একসঙ্গে বসতে সম্মত হবে না। বিপিন পাল মন্তব্য করেন, এই যদি দেশের অবস্থা হয় তাহলে 'দিল্লী তো অনেক দূরে'। যেখানে সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ে এমনভাবে শতধা বিভক্ত হয়ে আছে সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দেশে কোন গঠনমূলক নেতৃত্ব নেই। 'ষড়যন্ত্র' ও 'কূটনীতি' প্রয়োগ করে কিভাবে দ্রুত ফল পাওয়া যায় সেদিকেই সকলের লক্ষ্য। সার্বজনীন মঙ্গলের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করছে। কোন আদর্শ ও নীতিবোধ সামনে না রেখে জনসাধারণকে পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের অবস্থা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। এই অবস্থায় যাঁরা একবছরে বা একযুগে বা কুড়ি বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' অর্জনের কথা বলেন, তাঁরা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ নন ও বিবেক বুদ্ধিবর্জিত, তাই প্রমাণিত হয়েছে।[২৭]

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে বিপিন পাল 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লেখেন তা পড়ে মহম্মদ আলি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাঁর 'দি কমরেড' কাগজে বিপিন পালের সমালোচনার উত্তর দেন। এই সাপ্তাহিক কাগজ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হত, মহম্মদ আলি ছিলেন সম্পাদক। প্রথমে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বিপিন পাল যে মন্তব্য করেন সে বিষয়ে মহম্মদ আলি কি অভিমত পোষণ করেন, তা আলোচনা করা যাক। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশন থেকেই বিপিন পাল ও মহম্মদ আলির মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাঁর কাগজে মহম্মদ আলি নাগপুরে দেশবন্ধু দাসের মত পরিবর্তন ও আত্মত্যাগের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, সম্ভবত দাসের বিরোধীদের মধ্যে একজন এখনও তাঁকে ক্ষমা

প্রদর্শন করেননি। মহম্মদ আলি যে বিপিন পালের কথা বলেন তা প্রবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায়। কিন্তু এই মতান্তর তখনও তিক্ত-তায় পর্যবসিত হয়নি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধীকে যে ভাষায় বিপিন পাল আক্রমণ করেন তা মহম্মদ আলির কাছে 'লজ্জাকর' বলে মনে হয়েছে।[২৪] এই সময়ে মহম্মদ আলি যেসব মন্তব্য করেন তাতে বিপিন পাল খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। মহম্মদ আলি লেখেন, যাঁরাই মহাত্মা গান্ধীর সুন্দর অনু-ভূতির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সবাই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী প্রেরিত শোকবার্তায় গভীরভাবে বিচলিত হন। তিনি আসাম ভ্রমণ বাতিল করে বাংলা দেশের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যতদিন পর্যন্ত স্বরাজ পার্টির অনুগামীরা বাংলা দেশে তাঁর উপস্থিতি ও সেবা প্রয়োজন মনে করবে ততদিন তিনি সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনায় এমন একটি মহৎ মনের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি সব সময় অপরের জন্য চিন্তা করেন। একজন অসহযোগপন্থীরূপে মহম্মদ আলির মনে হয়েছে, যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, তাঁদের প্রকৃত স্থান কোথায়। নাগপুরে দেশবন্ধু দাসের সিদ্ধান্তের পর বিপিন পাল কলকাতার 'ইংলিশম্যান' কাগজে যোগ দেন। আর তিনিই এই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন, মহাত্মা গান্ধী যদি দেশবন্ধু দাসের 'গদি' দখল করেন তাহলে কি হবে। আর বিপিন পাল একথাও বলেন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মহাত্মা গান্ধীকে বাধা দেওয়া দরকার যাতে তিনি বাংলা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার না করতে পারেন। এই গান্ধী-বিরোধিতা মহম্মদ আলি কর্তৃক ধিক্কৃত হয়। এই সময়কার মহম্মদ আলির রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি ইসলাম-বিরোধী ও গান্ধী-বিরোধী লেখক-দের নির্ভয়ে সমালোচনা করেন।[২৫] প্রসঙ্গত তিনি 'দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার' লেখকের সঙ্গে বিপিন পালের তুলনা করেন। এই

কাগজের একজন লেখকের, যিনি নিজের নাম গোপন রাখেন, পবিত্র কর্তব্য হল ভারতবর্ষের যা কিছু ভালো তারও সমালোচনা করা। কিন্তু 'আত্মপ্রচারে অভ্যস্ত' বিপিন পাল নিজনামে, 'ইংরেজের নীল চোখে' 'ইংলিশম্যান' কাগজে প্রবন্ধ লেখায় কোন সংকোচবোধ করেন না।[২৬]

তারপর আলি ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে বিপিন পালের অভিযোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন মহম্মদ আলি। ৩রা জুলাইয়ের বিপিন পালের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে উভয় নেতার মধ্যে পত্রালাপ হয়। এই প্রবন্ধের খবর পেয়ে মহম্মদ আলির নির্দেশে তাঁর একজন সহকারী বিপিন পালকে একটি পত্রে প্রবন্ধের কপি পাঠাতে বলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই এই পত্র পাঠানো হয়। মহম্মদ আলির ধারণা 'ইংলিশম্যান'-এর কপি পাঠিয়ে দেবার জন্য নিজে বিপিন পালকে পত্র না লিখে তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে পত্র পাঠানোর ফলে এবং ২৬শে জুনের 'কমরেড' কাগজে প্রকাশিত তাঁর অভিমত পড়ে বিপিন পাল ক্ষুব্ধ হন। তাই তাঁর পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালকে দিয়ে যে পত্র মহম্মদ আলির সেক্রেটারীর কাছে পাঠান তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মহম্মদ আলির সৌজন্যবোধ থাকলে অথবা সত্য ঘটনা জানবার ইচ্ছা থাকলে 'ইংলিশম্যান' কাগজে যোগ দেবার বিষয় নিয়ে বিপিন পালের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা কথা লিখতেন না।[৭২] 'ইংলিশম্যান'-এর ফাইল থেকেই এই কুৎসা ধরা পড়বে। বরিশাল প্রদেশ কনফারেন্সের কয়েকমাস পরে স্বরাজ্য পার্টির অনুগামীরা অথবা অসহযোগপন্থীরা বিপিন পালের নীতি ও আদর্শ, যা তিনি সভাপতির ভাষণে ব্যক্ত করেন, তার বিরোধিতার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। তখন বিপিন পাল তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবার প্রয়োজনে 'ইংলিশ-ম্যান' কাগজে লিখতে আরম্ভ করেন। এই কাগজই আগ্রহসহকারে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত করে। কলকাতার অন্য কোন কাগজ বিপিন পালকে এই সুযোগ দিতে চায়নি। যদি মহম্মদ আলি 'ইংলিশম্যান'

কাগজে প্রকাশিত বিপিন পালের স্বাধীন মতামত, যা অনেকক্ষেত্রে কাগজের মতের বিপরীত, পাঠ করতেন তবে এই মিথ্যা অভিযোগ দ্রুত ছাপাতেন না। একে নিশ্চয়ই সৎ সাংবাদিকতা বলে না'। অন্তত বিপিন পালের তাই ধারণা। তাঁর সঙ্গে মহম্মদ আলির মতপার্থক্য আছে। তাছাড়া 'স্বরাজ' ও 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে মহম্মদ আলির মতেরও প্রকাশ্য সমালোচনা বিপিন পাল করেন। তবুও তিনি কখনও মহম্মদ আলির মত ব্যক্তিগত চরিত্র হননের পথ গ্রহণ করেননি। আজ যদি দেশবন্ধু দাস জীবিত থাকতেন, বিপিন পালের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও, তিনিই প্রথম বিক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে, যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, এই হীন অভিযোগ অস্বীকার করতেন। বিপিন পালের রাজনৈতিক মত বা প্রচার কখনই সরকারী বা বে-সরকারী অর্থদ্বারা সহায়তা করা হয়নি। অবশ্য এও তিনি আশা করেন না যে, ভিন্ন আদর্শ ও জীবনে বিশ্বাসীরা একথা উপলব্ধি করবেন। ২৫শে জুলাই জ্ঞানাঞ্জন পাল এই চিঠি লেখেন। তিনি মহম্মদ আলির সেক্রেটারীকে একথাও এই পত্রে জানিয়ে দেন যে, তাঁর ২২শে জুলাইয়ের পত্র 'ইংলিশম্যান'-এর ম্যানেজারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহম্মদ আলির আচরণে বিপিন পাল যে দুঃখিত হন, তাও জ্ঞানাঞ্জন পালের পত্রে জানা যায়।[২৮]

মহম্মদ আলি তাঁর প্রবন্ধে বিপিন পালের প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দেন। বিপিন পাল 'extra-territorial patriotism'-এর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এই বিশেষ শব্দ মহম্মদ আলির আবিষ্কার নয়। মিঃ মণ্টেগু যখন আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ছিলেন তখন তিনি হাউস অব কমনসে বিতর্কের সময় ভারতীয় মুসলমানদের 'extra-territorial patriotism' পরিহার না করেও তার সঙ্গে 'territorial patriotism'-এর কিছু উপকরণ যুক্ত করতে বলেন। সুতরাং এই

শব্দগুলো মণ্টেগু ব্যবহার করেন।[২৯]

'প্যান ইসলামিজম্' সম্পর্কে বিপিন পাল যে সব কথা মহম্মদ আলির বলে উল্লেখ করেন তা তাঁর নিজের বক্তব্য নয়। মহম্মদ আলি লেখেন, তিনি 'ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধে' (Islamic Brotherhood) বিশ্বাসী। আর তাই হল ইসলাম। এই 'ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধ' অর্থেই প্যান ইসলাম মতবাদ তিনি সমর্থন করেন।[৩০] তাছাড়া তিনিও জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেখানে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোন শোষণ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের কেউ যদি পরাজিতের মনোভাব নিয়ে, সুযোগের সন্ধানে থেকে, অপহৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার দিবা-স্বপ্নে মশগুল থাকেন, তাঁদের সঙ্গে মহম্মদ আলির মতের কোনই মিল নেই। স্বভাবতই বিপিন পালের এই অভিযোগ তিনি অগ্রাহ্য করেন।[৩১]

কিন্তু বিপিন পালের মত অনন্তকাল ধরে 'গণতান্ত্রিক স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য শ্বেত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে মহম্মদ আলি রাজী নন। 'ইংলিশম্যান' কাগজের মাধ্যমে বুর্জোয়া ব্যবস্থা (যা বিপিন পাল সমালোচনা করেন) ছাড়া অন্য কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। বিপিন পালের এমন যোগ্যতাও নেই যাতে তিনি জনসাধারণকে নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত করাতে পারেন। প্রধান কথা হল, বিপিন পাল একবার জেলে গিয়ে আর দ্বিতীয়বার যেতে রাজী নন। তাই কলকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট বা চৌরঙ্গীর এমন জায়গায় তাঁকে পাওয়া যায় যেখানে অন্য ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর ঝাঁজাল রচনা সমাদর পাচ্ছে। তাই তাঁরা বিপিন পালের 'ঘেউ ঘেউ শব্দ' (bark) কেবলমাত্র সহ্য করেন না, পছন্দও করেন, কারণ তাঁরা জানেন তাঁর 'কামড়ানোর' (bite) শক্তি নেই। এই ভাবে মহম্মদ আলি নিন্দাসূচক ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করেন।[৩২]

তারপর মহম্মদ আলি বলেন, বিপিন পাল 'গণতান্ত্রিক স্বরাজের'র সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বললেও তিনি মনে করেন না যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। অন্যদিকে 'প্যান ইসলামিস্ট' মহম্মদ আলি All Parties Conference এ প্রকাশ্যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপন করেন এবং পুনরায় অ্যানি বেশান্তের কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় বিল আলোচনার সময় এই দাবীর পক্ষে ভোট দেন। মহম্মদ আলি বিদ্রূপ করে লেখেন, ঘটনা এই যে 'মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল হলেন মিঃ বিপিন চন্দ্র কাপুরুষ' (Mr. Bepin Chandra Pal is Mr. Bepin Chandra Poltroon), যিনি কখনই সরকারী ক্ষমতা বর্তমান আমলাতন্ত্র থেকে ছিনিয়ে নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন না। কারণ এইভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে গেলে যে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তা তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।[৩৩] কাজ করার ক্ষেত্রে যিনি মন্থরতার পক্ষপাতী, তিনিই সব সময় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেন। অন্যেরা যখন কর্মরত তখন বিপিন পাল 'চিন্তা' করেন অর্থাৎ 'কথা বলেন'। যতই তিনি 'গণতান্ত্রিক স্বরাজের' কথা বলুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে মনের দিক থেকে তিনি সেই ধরণের স্বৈরতান্ত্রিক যাঁদের আবির্ভাব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটে। বিপিন পাল যে স্বরাজের কথা বলেন, তা হল 'Demagogic Swaraj'।[৩৪] এইভাবে মহম্মদ আলি বিপিন পালের মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সমগ্র রচনাটিই বিদ্রূপ ও পরিহাস মিশ্রিত।

জ্ঞানাঞ্জন পাল লিখিত ২৫শে জুলাইয়ের পত্র পেয়ে মহম্মদ আলির নির্দেশমত তাঁর সেক্রেটারী এইচ, রহমান ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এক দীর্ঘ পত্র জ্ঞানাঞ্জন পালকে লেখেন। মহম্মদ আলি জানতে চান, কলকাতার অন্য কাগজে লিখবার সুযোগ না পেয়ে কি বিপিন পাল 'ইংলিশম্যান' কাগজের বদান্যতা গ্রহণ করে সেখানে প্রবন্ধ লিখেছেন ? 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখে কি তিনি

টাকা পান ? 'বেঙ্গলি', 'পত্রিকা' ও 'সারভ্যাণ্ট' কাগজ কি বিপিন পালের লেখা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে ? তিনি কি নিজেই 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখবার জন্য আবেদন করেন ? না, তাঁরাই তাঁকে অনুরোধ করেন লিখতে ? এই চিঠিতে একথাও বলা হয়, ইসলাম ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে মহম্মদ আলির অভিমত সম্পর্কে বিপিন পাল অজ্ঞ এবং তাঁর প্রবন্ধে অনেক তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। যদিও 'কমরেড' কাগজে এই বিষয় নিয়ে মহম্মদ আলির অসংখ্য রচনা আছে। তা সত্ত্বেও মহম্মদ আলির নিজের রচনা থেকে একটি লাইনও উদ্ধৃতি না দিয়ে বিপিন পাল তাঁর সমালোচনা করেন। এমন নয় তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের কোনই সুযোগ ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দিল্লীতে দুজনে দীর্ঘকাল ছিলেন। তখন বিপিন পাল তাঁর মতামত জেনে নিতে পারতেন।[৩৫]

মহম্মদ আলির মতে, সব ধর্মের মৌলিক নীতি হল 'theocracy'। জাতীয়তাবাদকে যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা সংশোধিত না করা হয় তবে তা মানবজাতির কাছে অভিশাপরূপেই দেখা দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তখন জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব ছিল 'My country right or wrong'। তাই এই অর্থে ঈশ্বর মানবসমাজ সৃষ্টি করেন, আর শয়তান জাতি তৈরী করে (God made mankind, and the Devil made the Nation)। মহম্মদ আলি আশা করেন, সব অ-মুসলমান ভারতীয়রা তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচার সহ্য করবেন, তেমনি তিনি চান সমস্ত মুসলমানেরাও ভারতের অ-মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচার মেনে নেবেন। অ-মুসলমানদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর আদৌ নেই। অন্যদিকে অ-মুসলমানদের কাছ থেকেও তিনি এই ব্যবহার আশা করবেন। প্রসঙ্গত তিনি গরু সম্পর্কে হিন্দু মনোভাব আলোচন করেন। গরুর প্রতি পবিত্রতা আরোপ করা তাঁর কাছে 'হিন্দু

—৪

কুসংস্কার' বলেই মনে হয়। তবুও হিন্দু ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত মহম্মদ আলি নিজের পরিবারে গোমাংস ভক্ষণ করা বন্ধ করে দেন। গত বছর মহাত্মা গান্ধী যখন অনশন ভঙ্গ করেন তখন মহম্মদ আলি তাঁকে একটি গরু উপহার দেন। তাই মহম্মদ আলি জিজ্ঞাসা করেন, 'এমন একজন ব্যক্তি জাতীয়তাবাদীদের কাছে আতংকের কারণ হবেন কেন'?[৩৬]

সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন মহম্মদ আলি। কারণ তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সৈন্যরূপে ব্যবহার করতে পারবে না। এইজন্য অন্যান্য ভারতীয় দেশ-প্রেমিকদের সঙ্গে তিনিও অবিলম্বে 'স্বরাজ' প্রশ্নের সমাধান চান। স্বভাবতই বিপিন পাল একথা বলতে পারেন না যে, তিনি এই সমস্যা সমাধানে মহম্মদ আলির চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহশীল।[৩৭]

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বিপিন পাল একটি সংশোধনী প্রস্তাবে 'স্বরাজ' শব্দের পূর্বে 'গণতান্ত্রিক' শব্দ জুড়ে দিতে চান। একজন মুসলমান হিসাবে মহম্মদ আলি সমস্ত রকমের স্বৈরতন্ত্রকে ঘৃণা করেন। নাগপুরে তিনি বিপিন পালের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, কারণ তিনি 'অনাবশ্যক পুনরুক্তিতে' (tautology) বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, স্বরাজ তো গণতান্ত্রিক হবে। এমনকি মহম্মদ আলি 'রিপাবলিকান পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠারও পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এসেম্বলির সদস্যরূপে যিনি রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন তাঁর পক্ষে এ দাবী করা সম্ভব নয়।[৩৮]

'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে মহম্মদ আলির অভিমত বিপিন পাল ভুলভাবে উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতির ভাষণ নিয়ে মহম্মদ আলি বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তখন তিনি 'স্বরাজ' সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেন।[৩৯] তাঁর মতে, স্বায়ত্ত-শাসনের অর্থেই 'স্বরাজ' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়।

'স্বরাজ' অর্জনের পর জনসাধারণ সমগ্র জাতির জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কারণ প্রকৃত ক্ষমতা পাবার পর তা করা সম্ভব। যখন ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রের 'কমা' পর্যন্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও নেই, তখন ভবিষ্যত ভারতের শাসনতন্ত্র কি হবে তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে ঝগড়া করার মত বোকামি করতে মহম্মদ আলি প্রস্তুত নন। প্রসঙ্গত একথাও বলা হয়, ইউরোপের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ও আইন বিষয়ে মহম্মদ আলির জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। তাই ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের পর তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানে তিনি 'স্বরাজ' অর্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন।[৪০] কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা এখনই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চান। যদিও সে ক্ষমতা আগামী দিনে বিজয় লাভের পর অর্জন করা সম্ভব। ভারতীয়দের অবস্থা জেনেই মহম্মদ আলি তাঁদের প্রস্তাবিত পথ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তাঁর মনে হয়, দীর্ঘকাল এক অবাস্তব অবস্থার মধ্যে বাস করায় ভারতীয়রা শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য ব্যস্ততা দেখান, কল্পনা করেন বিতর্ক সভায় বসে শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব এবং তাঁরা যার প্রয়োজন বোধ করেন তা হল বেশীর ভাগ সদস্যের ভোট। অনেকদিন ধরে তাঁরা ইতিহাস তৈরী থেকে এবং ইতিহাস-সম্মতভাবে চিন্তা করতে বিরত আছেন। তাঁদের কোন ধারণা নেই, কিভাবে অন্যদেশ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার আদায় করতে অথবা শাসনতন্ত্রের একটি ধারা রহিত করতে শত-সহস্র লোকের মূল্যবান জীবন দান করেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন কি ধরণের শত্রুর সঙ্গে তাঁদের ভারতবর্ষে সংগ্রাম করতে হবে।[৪১]

এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ভবিষ্যতে ভারতের শাসনতন্ত্র কি হবে তা নিয়ে এখনই জল্পনা-কল্পনা করে সময় নষ্ট করতে প্রস্তুত নন। তাছাড়া 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র জাতির সামনে যে 'বারো পয়েন্ট'

রেখেছেন তাতো শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের বিবেচনার জন্যও রয়েছে।[৪২] এই পত্রে একথাও বিপিন পালকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে 'ভারতবর্ষ ও ইসলামকে মুক্ত' করার জন্য মহম্মদ আলি আবার দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করতে প্রস্তুত, তবুও বিপিন পালের মত 'ইংলিশম্যান' কাগজের বদান্যতা গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন।[৪৩] ৩১শে জুলাইয়ের (১৯২৫ খ্রী) পত্রে এই সব বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট পুনরায় মহম্মদ আলির সেক্রেটারী এইচ, রহমান জ্ঞানাঞ্জন পালের কাছে একটা ছোট্ট পত্রের সঙ্গে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর 'কমরেড' পত্রিকায় প্রকাশিত বেলগাঁওতে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে মহম্মদ আলির প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন।[৪৪] এই প্রবন্ধে Islamic Theocracy ও Indian Nationalism নিয়ে মহম্মদ আলির মতামত পাওয়া যায়। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়: 'হিন্দুমুসলিম ঐক্য'। বিপিন পালকে এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করা হয়। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল।[৪৫] মহম্মদ আলি লেখেন, মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ প্রোগ্রামের বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্তটি বজায় রাখতে চান। কিন্তু জাতীয় বাহিনী যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকে তবে শত্রুর সঙ্গে নিজস্ব শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোন জেনারেল কি পরস্পর কলহকারী সৈন্যদের দ্বারা গঠিত সেনা-বাহিনী পরিচালনা করতে পারেন? মহাত্মা গান্ধী ঠিক কথাই বলে-ছেন, কিছু সংখ্যক হিন্দু ও কিছু সংখ্যক মুসলমান ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীলতাই পছন্দ করবেন যদি না তাঁরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু ভারত, অথবা মুসলমান-ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তারপর মহম্মদ আলি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান আছে তা থেকে একথা বলতে পারি, একজন মুসলমানের অ-মুসলমানের উপর মুসলিম শাসন চাপিয়ে দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং তেমনি মুসলমান

প্রজাদের দ্বারা অ-মুসলমান শাসন বিপর্যস্ত করার প্রশ্নও ওঠে না যতদিন পর্যন্ত সেখানে একজন মুসলমান বিনা বাধায় ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করতে পারেন। ইসলামীয় Theocracy এবং কোরাণের ভাষায় 'ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সরকার নেই' ("There is no Govt. but God's') এবং 'কেবলমাত্র ঈশ্বরের সেবার জন্যই আমরা আদিষ্ট' ('Him alone are we Commanded to Serve')। অন্যসব ধর্মের মত, ইসলামেও এমন কিছু বিধি আছে যা প্রতিটি মুসলমানের অনুসরণ করা কর্তব্য, আবার এমন কিছু বিধান আছে যা তাদের পালন করা উচিত নয়। এই করা-বা-না-করার মধ্যে অনেকখানি জমি পড়ে আছে যেখানে একজন মুসলমান মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন। অবশ্য এখানেও কয়েকটি বিষয় তাকে নির্বাচন করে চলতে হয়। একজন মুসলমান কখনই ঈশ্বর সৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে মান্য করবে না যিনি তাঁকে ইসলামের বিধি-নিষেধ অবহেলা করতে নির্দেশ দেবেন, যদি সে ব্যক্তি তাঁর পিতা-মাতা, প্রভু বা শাসকও হয়; আবার যদি সে শত্রু বা বন্ধু হয়; অথবা সে যদি মুসলমান অথবা অ মুসলমান হয়। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের জাগতিক শক্তি একজন মুসলমানের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে উপযোগী রয়েছে এবং সব সময় খলিফার পরিচালনাধীন আছে, ততদিন একজন মুসলমান কার প্রজা হয়ে আছেন—মুসলমান অথবা অ-মুসলমানের—এই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তাঁর যা প্রয়োজন তা হল ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা। যদি কোন মুসলিম শাসন, এমনকি খলিফাও, তাঁকে ঈশ্বরকে অমান্য করতে নির্দেশ দেয়, তবে তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন। ইসলামের প্রতি অনুগত একজন মুসলমানের কর্তব্য নির্ধারণ করার পর মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন, এই যখন অবস্থা তখন 'স্বরাজ সরকারের' প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলবার কি প্রয়োজন আছে, বিশেষ

করে 'স্বরাজ সরকার' যখন 'স্বধর্ম' রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।[৪৬] যখন স্বরাজের নামে মুসলমানের উপর এমন কিছু বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হবে যেসব শর্ত ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার সামিল হয়, তখন তিনি তা মানতে অস্বীকার করবেন এবং বিদ্রোহ করবেন। একই কারণে ভারতবর্ষে যদি 'স্বরাজ সরকার' প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দিল্লীতে মুগল শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, অথবা তুরস্কে মহম্মদ ওয়াহিদউদ্দিনের বিতাড়নের পূর্বেকার খলিফার নিজস্ব শাসনও হয়, যা তাঁর উপর এই ধরণের শর্ত চাপিয়ে দেবে, তাকে অমান্য করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। ঈশ্বরের সরকার (God's government) সাধারণত হিন্দু বা খ্রীষ্টান সার্বভৌমত্বের বিরোধী নয়। কিন্তু তার সঙ্গে মুসলমান শাসকের বিরোধ হতে পারে যদি সেই শাসক ঈশ্বরের নির্দেশের পরিবর্তে নিজের নির্দেশ মানতে আদেশ দেন। এই কারণে একজন মুসলমানের পক্ষে মুসলমান বা অ-মুসলমান শাসক পরিচালিত সরকারের প্রতি অনুগত থাকা সম্ভব।[৪৭] প্রশ্ন হল, কাকে আগে স্থান দেওয়া হবে: ঈশ্বর অথবা মানুষ (God or Man)। যাঁরা মুসলমানদের আহ্বান জানান ঈশ্বরকে দ্বিতীয় স্থান দিতে তাঁরা মুসলমানদের নিজেদের বিশ্বাস বিসর্জন দিতে বলেন। স্বভাবতই তাতে কোন মুসলমান সম্মতি দিতে পারেন না। কোন হিন্দু, শিখ, পার্সী, খ্রীষ্টান ও ইহুদি নিশ্চয়ই এই ধরণের ব্যবস্থা অনুসরণে সম্মত হবেন না। তাই মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন, যখন তাঁদের 'স্বধর্ম' অনুসরণে প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা প্রস্তুত, তখন মুসলমানদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? অ মুসলমান মনোভাবের প্রতি যাঁদের আনুগত্য রয়েছে তাঁরাই মুসলমানদের ক্ষমতা সংকোচনের পক্ষপাতী এবং আবার তাঁরাই মুসলমানদের কাছ থেকে এমন সরকারের প্রতি আনুগত্য দাবী করেন যা ঈশ্বরের প্রতি মুসলমানদের যে দায়িত্ব রয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করে।[৪৮] তাঁদের

সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কি পার্থক্য তা নিয়ে মহম্মদ আলি আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মহাত্মা গান্ধী কোন হিন্দু বা মুসলমান, ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি বা নাস্তিকের কাছ থেকে এই ধরণের কোন দাবী করেন না। তিনি আশা করেন সবাই তাঁদের বিবেক অনুযায়ী চলবেন। এই কারণে মুসলমানেরা তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা' ও 'গোঁড়া' ব্যক্তিদের পরিবর্তে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করেন।[৪৯] মহম্মদ আলির মত মুসলিম নেতারা ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান, এই অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে মহম্মদ আলি লেখেন, সেই মুসলমানদের স্থান ভারতবর্ষে নয় যিনি ভারত-বর্ষকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শাসনাধীন রাখতে চান। তেমনি সেইসব হিন্দুর স্থানও ভারতবর্ষে নয় যাঁরা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত হয়ে বলা চলে, ভারতবর্ষে এই মতের লোকের সংখ্যা খুবই কম। বেশী হোক বা কম হোক, ভারতীয়দের কর্তব্য হল যৌথভাবে এই ধর্মান্ধতাকে পরাজিত করা এবং ভারতবর্ষে 'স্বরাজ' ও 'স্বধর্মের' পথকে সুগম করা।[৫০] ধর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ রাখবার পর ভারতবাসী খুব সহজে বিবেক নিয়ে তাঁদের সমালোচনা করতে পারবেন যাঁরা ধর্মের নাম নিলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, স্বার্থপর লোকেরাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় হতাশা বোধ করেন। তাঁদের এখন সুযোগ হয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা নিয়ে ব্যবসা করবার।[৫১] মহাত্মার এই মন্তব্যে মহম্মদ আলি আনন্দ প্রকাশ করেন। গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে অনৈক্য ও বিরোধের কারণও মহাত্মা বিশ্লেষণ করেন। এইসব বিরোধে ধর্মই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন, ধর্মকে হাস্যজনক করা হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়কে ধর্ম-বিশ্বাসের নামে মহিমান্বিত করা হয়েছে। ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিরা তা

পালন করতে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা গান্ধী এ উক্তিও করেন, একটা গণ্ডগোল বাধানোর প্রয়োজনেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ-গুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে।[৫২] মহম্মদ আলির ধারণা, লিখতে ভুল করায় মহাত্মা গান্ধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য করেন। আরও ব্যাখ্যা করে মহম্মদ আলি বলেন, মহাত্মা আমাদের মতই চিন্তা করেন, দেশে যথার্থ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযোগ আছে, এবং যাঁরা অভিযোগ করেন এবং যাঁ দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা উভয়েই ধর্মের নামে গণ্ডগোল বাধান, অথবা তাঁরাই বিবাদমান সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উৎসাহী সমর্থক। এই পরস্পর বিবাদমান দলগুলোর ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার দূর করতে তাঁরা কিছুই করেন না। যদি তাঁরা এই বিবাদে প্রথমে ইন্ধন নাও যোগান, তাহলেও অবস্থা জটিল করে তোলার ব্যাপারে ত াঁদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।[৫৩] দিল্লীর ঐক্য সম্মেলন (Unity Conference at Delhi) ধর্মীয় পার্থক্য দূরীকরণে অবস্থাকে স্বাভাবিক করেছে। অন্তত মহাত্মা গান্ধীর তাই ধারণা। মহাত্মার সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করে মহম্মদ আলি লেখেন, সর্বদল সম্মেলন কমিটি (Committee of the All Parties Conference) বর্তমান রাজনৈতিক মতপার্থক্য সমাধানে একটি কার্যকরী ও ন্যায়সঙ্গত উপায় বের করতে পারবে। তারপর মহাত্মা গান্ধীর কথার প্রতিধ্বনি করে মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন: আমাদের উদ্দেশ্য হল অনতি-বিলম্বে সাম্প্রদায়িক ও স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব বিলোপ করা। একই নির্বাচন কেন্দ্র নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। আমাদের কাজের জন্য নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত পুরুষ ও মহিলা নিয়োগ করতে হবে। মহম্মদ আলির বিবেচনায় মহাত্মা গান্ধী হলেন বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ভবিষ্যতের পরিণতি সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন, তেমনি বর্তমানের প্রয়োজন সম্পর্কেও ত াঁর কোন অব-হেলার ভাব নেই।[৫৪] মহাত্মা গান্ধী যথার্থই ত াঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন

এই বলে : সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অথবা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মনোনয়-নের ব্যবস্থা অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘু-দের পথ করে দিতে হবে। কারণ তাঁরা সংখ্যাগুরুর মনোভাব সন্দেহ করেন। মহাত্মা গান্ধী সংখ্যাগুরুদের আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। মহাত্মা গান্ধীর এই সব উক্তি উদ্ধৃত করে মহম্মদ আলি বলেন, সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট হতে পারে যদি সংখ্যাগুরুরা ন্যায়বিচারের আদর্শ স্থাপন করেন। কেউ যেন এই না ভাবেন সংখ্যালঘুরা নৈরাশ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে, অথবা ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে করছে পরিশেষে মহম্মদ আলি উভয় সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করেন। এমনকি অনাহারে আক্রান্ত হয়েও তাঁরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হন। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন, হিন্দু-মুসলমানদের মনে রাখা উচিত ভারত বর্ষের বর্তমান দুরবস্থার প্রকৃত কারণ দাসত্ব, স্বরাজ নয়। অসুবিধা হল এই, স্বরাজ কখনই অর্জিত হবে না যদি না এই সব লক্ষণ বিলুপ্ত হয়।[৫৫] এই ভাবে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে মহম্মদ আলি গান্ধীজি ও সমসাম-য়িক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এইচ. রহমান যে পত্র জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে পাঠান, তার প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ পেলেও কোন উত্তর না পাওয়ায় মহম্মদ আলির নির্দেশমত পুনরায় ১৯শে আগষ্ট (১৯২৫ খ্রী) এইচ, রহমান জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে পত্র লিখে জানতে চান, বিপিন পাল 'ইংলিশম্যান' কাগজের আনুকূল্য গ্রহণ করে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক পান কি না। ৩১শে জুলাই এই বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তাই এখানে জিজ্ঞেস করা হয়। এই সম্পর্কে বিস্তৃত খবর পাবার জন্যে মহম্মদ আলি উদ্‌গ্রীব থাকেন। একথাও বলা হয় যে, খবর পাবার পর যদি মহম্মদ আলি দেখেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে বিপিন পালকে সমালোচনা করেছেন তাহলে তিনি নিঃসঙ্কোচে তা সংশোধন করবেন। অন্যদিকে মহম্মদ আলি

এও জানতে চান, বিপিন পাল ইসলাম, স্বরাজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মহম্মদ আলির মন্তব্য বলে ভুলভাবে যে সব আলোচনা করেন তা সংশোধন করতে সম্মত আছেন কিনা, অথবা যে সব তথ্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে তার সাহায্যে বিপিন পাল ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি সম্পর্কে তাঁর পূর্বের উক্তি সংশোধন করে কোন প্রবন্ধ লিখছেন কিনা।[৫৬]

তারপর ২৪শে আগস্ট জ্ঞানাঞ্জন বাবুর কাছে মহম্মদ আলির পক্ষ থেকে হাফিজুর রহমান টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চান, বিপিন পাল মহম্মদ আলির পত্রের উত্তর দেবেন কিনা। যদি না দেন তবে মহম্মদ আলি তাঁর সঙ্গে যে সব পত্রালাপ করেছেন তা প্রকাশ করবেন।[৫৭]

এই টেলিগ্রাম পাবার পর জ্ঞানাঞ্জন পাল জানান যে, মহম্মদ আলির পত্রের উত্তর পাঠানো হয়েছে। এই খবরটি পাবার পর মহম্মদ আলি যে পত্র পান তা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জ্ঞানাঞ্জন পাল লেখেন। খুবই সংক্ষিপ্ত পত্র। এই পত্রে তিনি হাফিজুর রহমানকে জানান, নিজের অসুস্থতা ও কলকাতাতে ভ্রাতার অভিনয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তিনি আরও পূর্বে পত্রের উত্তর দিতে পারেননি। তাঁকে সম্বোধন করে পত্র দেওয়ায় জ্ঞানাঞ্জন বাবু দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বিপিন পালের সঙ্গে মহম্মদ আলির বিতর্ক তাঁদের দুজনের মারফত হওয়া উচিত নয়। মহম্মদ আলি তো সরাসরি বিপিন পালকে পত্র দিতে পারতেন। জ্ঞানাঞ্জন বাবু লেখেন, 'ইংলিশম্যান' কাগজের সঙ্গে বিপিন পালের যোগাযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি যে-সব কথা জানতে চান, সে বিষয়ে তিনি যেন বিপিন পালকে নিজেই পত্র দেন।[৫৮]

এই সংক্ষিপ্ত পত্র ও জ্ঞানাঞ্জন বাবুর কৈফিয়ত পেয়ে মহম্মদ আলি খুশি হননি। যাইহোক, জ্ঞানাঞ্জন বাবুর পত্র পেয়ে মহম্মদ আলি নিজেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট বিপিন পালকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন।[৫৯] মহম্মদ আলি লেখেন, যেহেতু তিনি নিজে খুব

ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁর শরীরও ভাল নেই, সেজন্য তাঁর কাগজের সম্পাদক বিভাগের একজনকে পত্র লিখতে বলেন। এর মধ্যে অসঙ্গতি কি আছে? ২২শে জুলাইয়ের চিঠিতে তো 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত ৭রা জুলাইয়ের প্রবন্ধটি চাওয়া হয়। ২২শে জুলাইয়ের পত্রের উত্তরে ২৫শে জুলাই জ্ঞানাঞ্জন পাল মহম্মদ আলি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন তা আলোচনা করে মহম্মদ আলি লেখেন, বিপিন পাল তাঁর পুত্র মারফত তাঁর কাজের কটূক্তিপূর্ণ উক্তি করেন। এই পত্রে মহম্মদ আলি পুনরায় জানতে চান কি অবস্থায় 'স্বাধীন মতামত' প্রকাশের জন্য বিপিন পাল 'ইংলিশমান' কাগজের আনুকূল্য গ্রহণ করেন এবং কলকাতার অন্য সব কাগজ তাঁকে কেন এই অধিকার দিতে অস্বীকৃত হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তিনি ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি সোজা প্রশ্নের উত্তর চান। কিন্তু প্রায় একমাস সময় নিয়েও বিপিন পাল কোন উত্তর দেন নি। যদিও মহম্মদ আলি তাঁর রচনাবলী বিপিন পালকে পাঠিয়ে দেন। এই সব তথ্য পেয়ে বিপিন পাল মহম্মদ আলির মতামত সম্পর্কে তাঁর 'বোকা ধারণা' পরিবর্তন করেছেন কিনা এবং 'সৎসাংবাদিকতার ধ্বজাধারী' হিসাবে বিপিন পাল যদি কিছু লিখে থাকেন, তাও মহম্মদ আলি জানতে চান।[৬০] কিন্তু বিপিন পালের কাছ থেকে তিনি কোনই উত্তর পাননি। যদিও ২৯শে আগস্ট পোস্ট অফিসের প্রাপ্তিস্বীকারের চিহ্ন আছে। চিঠিটি রেজিষ্ট্রি করেই পাঠানো হয়।[৬১] পরিশেষে হেমলেটের ভাষায় মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন 'নীরবতাই বিশ্রাম'। এখানেই এই বিতর্ক সমাপ্ত হয়। তারপর এই দুই নেতার মধ্যে আর কখনই স্বাভাবিক সম্পর্ক হয় নি।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুগের ভারতীয় মুসলিম সমাজের ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁদের সম্পর্কে অনেকে

আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের রচনাবলী বিশেষ করে মহম্মদ আলির অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকা এখনও গবেষকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। কয়েকটি গ্রন্থে তাঁদের বিবৃতি ও মন্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা কষ্টকর। কোন কোন লেখকের কাছে মহম্মদ আলি একজন সাম্প্রদায়িক নেতারূপেই প্রতিভাত হন। অন্তত তাঁদের সন্নিবিষ্ট তথ্যের বিশ্লেষণ পড়ে তাই মনে হবে। কিন্তু এই মনোভাব প্রকাশে আজকের লেখকদের নিজস্ব কোন অবদান নেই। অনেক পূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যান' কাগজে প্রকাশিত বিপিন পালের প্রবন্ধেই তার সূত্র-পাত হয়। তখন মহম্মদ আলি অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর প্রবন্ধ না পড়েই বিপিন পাল বিকৃতভাবেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। আজকের লেখকদের রচনা পাঠ করলেও এ ত্রুটি চোখে পড়বে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত 'কমরেড' পত্রিকার ফাইল অনেকেই ভালো করে দেখেননি। অথচ এই ফাইল থেকে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ধর্মীয় রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। এই কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে দুই নেতার উক্তি বিস্তৃত-ভাবে উল্লেখ করা হল। এই সব তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না 'ইসলাম' ও 'ভারতের স্বরাজের' প্রতি আস্থাশীল মহম্মদ আলি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন। অন্তত বিপিন পালের চেয়ে যে তাঁর মতবাদ এই সময়ে অগ্রসর ছিল তা বোঝা যায়। 'ইংলিশম্যানের' সঙ্গে বিপিন পালের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে কি ধরণের ছিল, সে বিষয়ে আরও তথ্য পেলে এই সময়ে বিপিন পালের ভূমিকা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভাবতে অবাক লাগে, বারে বারে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি কেন মহম্মদ আলিকে কোন উত্তর দেন নি? কেন তিনি এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন? বিপিন পাল মহম্মদ আলির বিতর্কে বিপিন পাল কোন জোরালো বক্তব্য রাখতে পারেননি। যে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন মনে হবে না।

সূত্র নির্দেশ

১ 'An Unpleasant Correspondence' by Mohamed Ali, The Comrade, September 4, 1925, p. 110.

২ Ibid.

৩ Ibid.

৪ Ibid.

৫ 'Element of Reckless Abandon' by Bipin Chandra Pal, The Englishman, June 18, 1925.

৬ The Englishman, June 26, 1925.

৭ 'The Curtain Falls : Grave Problem of the Succession' bv Bipin Chandra Pal, The Englishman, June 20, 1925.

৮ Ibid.

৯ Ibid.

১০ Ibid.

১১ 'The Problem and the Situation : Extraterritorial Patrotism' by Bipin Chandra Pal, The Englishman, July 3. 1925.

১২ Ibid.

১৩ Ibid.

১৪ Ibid.

১৫ Ibid.

১৬ Ibid.

১৭ Ibid.

১৮ Ibid.

১৯ Ibid.

২০ Ibid.

২১ Ibid.

২২ Ibid

২৩ Ibid.

২৪ The Comrade, June 26, 1925 ; September 4, 1925 p. 111.

২৫ Ibid, June 26, 1925.

২৬ The Comrade, September 4, 1925, p. 111

২৭ Letter of Jnananjan Pal, dated 25th July, 1925. Published in the Comrade, Sept. 4, 1925, pp. 111-112.

২৮ The Comrade, Sept. 4, 1925, pp. 111-112.

২৯ Ibid, p 112.

৩০ Ibid.

৩১ Ibid, p. 113.

৩২ Ibid.

৩৩ Ibid.

৩৪ Ibid.

৩৫ Ibid.

৩৬ Ibid, p. 114.

৩৭ Ibid.

৩৮ Ibid.

৩৯ The Comrade, 9th January, 1925, p. 8.

৪০ Ibid, Sept. 4, 1925, p. 114.

৪১ The Comrade, 9th January, 1925, p. 8.

৪২ Ibid.

৪৩ Letter of H. Rahman, dated 31st July, 1925. The Comrade, 4th Sept., 1925, p. 114.

৪৪ Letter of H. Rahman, dated 4th August, 1925. The Comrade, 4th Sept., 1925, p. 115.

৪৫ 'Hindu-Muslim Unity' by Mohamed Ali, The Comrade, 26 the December, 1924, pp 138-139.

৪৬ Ibid.

৪৭ Ibid.

৪৮ Ibid.

৪৯ Ibid.

৫০ Ibid.

৫১ Ibid.

৫২ Ibid.

৫৩ Ibid.

৫৪ Ibid.

৫৫ Ibid.

৫৬ Letter of H. Rahman, dated 19th August 1925, Published in the Comrade, September 4, 1925, p. 116.

৫৭ Ibid.

৫৮ Letter of Jnananjan Pal, dated August 24, 1925, Published in The Comrade, Sept. d 1925, p. 116.

৫৯ Letter of Mohamed Ali, dated August 26, 1925, Published in the Comrade, Ibid, p 117.

৬০ Ibid.

৬১ Ibid.

[ইতিহাস, নবপর্যায়, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৫ম খণ্ড, ১৩৭৭ বাংলা সন]

বাঙালী মুসলিম সমাজ ও একুশে ফেব্রুয়ারি

আমরা তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র। একুশে ফেব্রুয়ারির সংবাদ পাবার পরে আমাদের মনে এক গভীর আলোড়ন হয়। সদ্য দেশভাগজনিত বেদনা ও বিষাদ আমাদের মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার মধ্যে একটি আশার আলো আমরা দেখতে পেলাম। ওপারের ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের যে ঐতিহ্যগত আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রয়েছে তা আমরা নতুন করে অনুভব করলাম। রাষ্ট্রগত বিভেদের মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি এপার ওপার বাংলার জীবনে এক সাংস্কৃতিক-আত্মিক সেতুবন্ধ রচনা করে। আমরা কয়েকদিন একটানা একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলাম। আর বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি মুদ্রিত ইস্তাহার প্রকাশ করে ওপারের শহীদ বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার ও মাতৃ-ভাষার মর্যাদা রক্ষায় অংশগ্রহণকারী অগণিত মানুষের সঙ্গে আমাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। বন্ধুরা এই ইস্তাহারটি রচনার দায়িত্ব আমায় দিলেন। আমার রচনাটি সকলের অনুমোদন লাভের পর মুদ্রিত করে বিতরণ করা হল। এই ইস্তাহারে ঢাকায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি ছাত্র প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্তও উল্লিখিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা কার্যকরী করা সম্ভব না হলেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত করে একুশে ফেব্রুয়ারির শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে আত্মিক বন্ধনের উত্তাপ অনুভব করেছি। তখন থেকেই একুশে ফেব্রু-য়ারি আমার মনে গেঁথে আছে। সমগ্র ভারতীয় জীবনের পটভূমিতে বাঙালী জীবন নিয়ে ভাবনা চিন্তার সূত্রপাত এই ঘটনা থেকে নতুন করে শুরু হল। তারপরে অনেক সময় গড়িয়ে গেল। আজও

একুশে ফেব্রুয়ারি আমার চিন্তায় এক উজ্জ্বল দিক্‌-রেখা হিসেবে বিরাজমান।

কিন্তু, কেন? সে কথাই এবার বলব। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালী মুসলিম জীবনে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। তারই পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে মুসলিম মননকে গণতান্ত্রিক-মানবিক আদর্শে উজ্জীবিত করে একুশে ফেব্রুয়ারি। তাই মাতৃভাষার দাবিতে এই গণজাগরণকে প্রকৃত অর্থে বাংলার নবজাগরণ বলা যায়। কেন দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখে তা একটু ব্যাখ্যা করলেই আমাদের কাছে স্বচ্ছ হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম জাগরণের উপাদানগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করতে পারি: (ক) ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে এবং সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব; (খ) সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমান নেতাদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের প্রয়াস; (গ) হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের প্রচেষ্টা; (ঘ) বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলিম মননকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কয়েকজন মুসলিম লেখকের অবদান। সামগ্রিকভাবে এই সব আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী মুসলিম সমাজে জাগরণ ঘটে। এই উপাদানগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী যেমন মনে হবে, তেমনি প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদানের মধ্যেও অনেক বিরোধী উপাদানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলন গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্দীপিত করে। ফরাজী-ওয়াহাবী তত্ত্বেই জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা ব্রিটিশ

শাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন, তাঁরা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করেই তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম নির্ভর থেকে, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা ছিল তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষা সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত এবং নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমান-দের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে উজ্জীবিত করেন। পশ্চিমের উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক-মানবিক চিন্তাদর্শ যাতে ইসলামীয় সামাজিক কাঠামোর কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ খুবই সচেতন ছিলেন। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে এই উভয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট সহায়ক হয়। মুসলিম সমাজে অনেক অ ইসলামীয়বিধি-আচরণ প্রচলিত ছিল। সেগুলো পরিহার করে এই ধর্ম সংস্কারকেরা মুসলিম সমাজকে সংহতি প্রদান করেন। এই কাজটি প্রথমে শুরু করেন ওয়াহাবী ও ফরাজী ধর্ম সংস্কারকেরা। মুসলিম সমাজে জাগরণের ক্ষেত্রে এই সংহতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ায় বাঙালী মুসলমান তাঁর নিজস্ব পৃথক সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন হন। সাহিত্যচর্চাও শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাকে যথেষ্ট সজীব করে তোলে। বাঙালী মুসলমানদের মত একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এখানে যেভাবে জাগরণ ঘটেছে তাকে সমসাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই জাগরণকে একটি সুসঙ্গত ও সুস্থিত পথে পরিচালনা করতে না পারায় এর ভেতরে যে পরস্পর বিরোধী অনেক উপাদান ছিল তা ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে ওঠে, তার ফলে যুক্তিশীল-মানবিক উপাদানগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম-নেতাদের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে মানবিক-যুক্তিশীল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের

ক্ষেত্রটি নিয়ে অনুসন্ধান করলে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম সমাজে আত্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচনায় মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি বিপরীত ধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মুসলিম সমাজের এই নতুন জাগ্রত চেতনাবোধকে প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলে এক বৃহত্তর পটভূমিতে উন্নীত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে যেভাবে ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত করেন তাতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহজভাবে চলবার পথটি ক্রমান্বয়ে সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। এই কারণেই মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজিজ্ঞাসা এক সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। গোঁড়া মুসলমানদের নিন্দায় তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। এই যুগের আর একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ মাশহাদী। সংস্কৃত ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষায় গ্রন্থিত তাঁর রচনাবলী উল্লেখযোগ্য। তিনি বিজ্ঞান পরিশীলনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তাঁর রচনায় 'স্বাধীন', 'অখণ্ড ভারতবর্ষের' রাজনৈতিক চিত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও 'উগ্র স্বধর্মপ্রীতি' পণ্ডিত মাশহাদীর চিন্তার স্বচ্ছতাকে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করে। প্রসঙ্গতঃ আর একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির কথা বলছি। তাঁর নাম হল দিলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জ্জা। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী মুসলিম গ্রাজুয়েট। হুগলি জেলা নিবাসী দিলওয়ার ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। তিনি ইংরেজিতে মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'এসেজ অন ম্যাহোমেডাম সোসাল রিফর্ম' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৯) গ্রন্থে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের কথা থাকলেও, তিনি মুসলিম সমাজের সংস্কারের বিষয়টি ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের মনোভাব থেকেই

বিশ্লেষণ করেন। দিলওয়ার হোসেন আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সহ-সভাপতিও ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন, পণ্ডিত মাশহাদী ও দিলওয়ার হোসেন প্রণীত রচনাবলী, তৎকালীন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ও সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করে মুসলিম জাগরণ ঘটায় মুসলিম মননশীলতা এক ব্যাপক পরিধি নিয়ে ব্যাপ্ত হতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মুসলিম সমিতির সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলেও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের চিন্তা কত গভীরে ছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। মুসলিম সমিতিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল : আঞ্জুমান ই-ইসলামি, কলকাতা (১৮৫৫), ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন (১৮৫৬), ম্যাহোমেডান লিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা (১৮৬৩), সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা (১৮৭৬)। আবদুল লতিফ, আবদুর রউফ, নবাব আমির আলি, ও জাষ্টিস সৈয়দ আমির আলি প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তি এসব সমিতির পরিচালক ছিলেন। তাঁরা ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হন। আঞ্জুমান ই-ইসলামি মুসলমানদের সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিতে নিষেধ করে। তাছাড়া, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি প্রমুখ নেতার কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকাও লক্ষণীয়।

এই সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও লেখকদের অবদানে আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত হলেও তা শিক্ষিত মুসলমানের মনকে ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে বিশেষ প্রসারিত করতে পারেনি। এমন কি ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সে বিষয়েও কোন যথার্থ মুল্যায়ন মুসলিম বুদ্ধিজীবীর রচনায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে যে, নতুন মানব সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা কোন কোন সাধকের মধ্যে দেখা

যায় তাকেও প্রজ্জ্বলিত করার কোন প্রয়াস মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ও ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। এসব কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজে নবজাগরণের প্রবাহ প্রবল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে সমগ্র বাঙালী জীবনকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ ভাগ পর্যন্ত সময়-কালে বাংলার মুসলিম রাজনীতির প্রধান ধারাটি ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধকে আশ্রয় করেই প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন মুসলিম সমিতির ভূমিকা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলার মুসলিম পত্র-পত্রিকায় এই সমিতিগুলোর বিশদ কার্যবিবরণী পাওয়া যায়। বাংলার প্রতিটি জেলায় মুসলমান সম্মিলনী ও আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো তাঁরা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত করেই মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই ধারাটিকেই দ্বি জাতি-তত্ত্বের মোড়কে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। ভারতীয় ঐক্যের পটভূমিতে মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের সমস্যা সমাধান করে এক সুন্দর ও সুস্থ ভারতের ছবি জনমানসের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁরা অনুভব করেননি। শুধু তাই নয়, যেসব মুসলিম লেখক, শিল্পী ও রাজনীতিবিদ বাঙালী মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও যুক্তিশীল মননশীলতা সৃষ্টি করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে জাতীয় জীবনে একই স্রোতধারাকে বেগবান ও ব্যাপ্ত করতে চেয়ে-ছিলেন, তাঁদের সাধারণ মুসলমানদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করবার নিরন্তর প্রয়াসও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ করেন।

স্বদেশী যুগে মুসলিম সমাজের যে সব নেতা জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হক ও আবুল হোসেন। সুরাট কংগ্রেসের কিছুদিন আগে মেদিনীপুর শহরে জেলা সম্মেলন থেকে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা মডারেট রাজনীতির

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'স্বরাজ প্রস্তাব' যে সভায় গ্রহণ করেন, তার সভাপতি ছিলেন মৌলবী আবহুল হক। তিনি ছিলেন ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম ন্যাশনালিষ্ট কনফারেন্সের সভাপতি। আলিপুর বোমার মামলায় সরকার সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে যে সব জিনিষপত্র প্রদর্শন করে তার মধ্যে লিয়াকৎ হোসেন লিখিত পুস্তিকাও ছিল। এই যুগের বিপ্লবীরা তাঁদের ইস্তাহারে কেবল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাই উল্লেখ করেননি, তাঁরা একথাও বলেন মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের শাসনব্যবস্থা ইংরেজ শাসন থেকে অনেক শ্রেয় ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সম্মেলনের সেই দৃশ্যটি স্মরণ করা কর্তব্য মনে করছি: সভাপতি মহাশয়ের গাড়ীতে বসে আছেন আবহুল রসুল, তাঁর স্ত্রী ও আবহুল হালিম গজনভী। আর তার পেছনে পদব্রজে শোভাযাত্রায় চলেছেন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, অশ্বিনী-কুমার ও অন্যান্য হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ। সেদিন 'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি হিন্দু ও মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে, এই 'ধ্বনি' সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি। সভাপতির দীর্ঘ ভাষণের এক জায়গায় আবহুল রসুল বলেন: "আমরা এক অবিভক্ত জাতি রহিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সুতরাং কোন পার্থিব শক্তি আমাদিগকে বিভাগ করিতে পারে না। যদি আমরা বিশ্বাসঘাতক না হই, রাজকর্মচারীগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য যদি আমাদের জন্মগত সত্ত্ব বিক্রয় না করি, তবে আমরা নির্ভয়ে মানুষের মত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব এবং আমাদের চেষ্টা বিফল হইলে আমরা সন্তান-সন্ততিগণকে পিতৃপুরুষের এই কার্য্য সাধন করিতে বলিয়া যাইব। বিভাগ রহিত হইবেই, তবে সময় সাপেক্ষ। আমাদের প্রার্থনা এমন যুক্তিসঙ্গত ও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত যে, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান বাঙ্গালী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যাবসায় ও নিঃস্বার্থপরতার সহিত কার্য্য করিলে নিশ্চিতই সফলকাম হইবে।" আবহুল রসুলের

ভাষণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের যৌথ প্রয়াসে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল তা ব্যাহত হল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কার্য্যাবলীর ফলে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে মুসলিম সমাজে ধর্মীয়স্বজাত্যবোধের প্রভাব বোঝা যায়।

ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রথম পর্যায়ে (১৯১৫-১৯২১ খ্রীঃ) হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াস এক নবতরঙ্গ সৃষ্টি করলেও তার প্রভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাই আমরা দেখতে পাই ১৯২২ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি যৌথ ধারাটিকে বিপর্যস্ত করতে শুরু করে। এই পরিবেশে কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী যুক্তিশীল-উদারনৈতিক-মানবিক বোধের দ্বারা বাঙালী মুসলিম সমাজকে রূপান্তরিত করতে অগ্রসর হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঢাকায় প্রায় দশ বছর ধরে এই আন্দোলন মুসলিম সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীরা মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে 'ইসলাম বিরোধী' ও 'মুসলমানের অমিত্র' ঘোষণা করেন। তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। মুসলিম লীগের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আন্দোলনের ঔদার 'মানবিকতার বাণী' স্তব্ধ হয়ে যায়। বাঙালী মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' একটি সুস্থ চেতনা জাগ্রত করে বাঙালী সংস্কৃতিকে সজীব ও ব্যাপ্ত করতে প্রয়াসী ছিল। কিন্তু উগ্র ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের সাহায্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের প্রভাব বিনষ্ট করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সূচনার কয়েক বছর আগেই মুসলিম সমাজকে জাতীয় আন্দোলনের

সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সক্রিয় ছিলেন মুসলিম সমাজ থেকে আগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা। প্রসঙ্গতঃ আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আবদুল হালিম এবং আবদুল্লাহ রসুল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জমিদারী প্রথা অবসানের দাবি যুক্ত করে কৃষক সমাজকে উজ্জীবিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন খাতে বইয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রভাবশালী জমিদার জোতদার নেতৃবৃন্দ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দু মুসলিম কৃষক ও জনসমষ্টিকে জাতীয় আন্দোলনের একই স্রোতধারায় মিলিত করে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গড়বার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়নি। বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীর এক বৃহৎ ও প্রভাবশালী অংশ এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের রূপ সামনে রেখে যেমন যুক্তিপূর্ণ উদার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ সংস্কৃতির প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি, তেমনি তাঁরা একথার প্রতিও গুরুত্ব দেননি যে মুসলমানদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্তভাবেই সম্ভব। তাঁরা মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির পথ বেছে নেন। তাই আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা যুক্তিশীল মানবিক ধারার সমর্থক ছিলেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা সাম্যবাদী আদর্শের প্রচারক ছিলেন তাঁরা সবাই মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গনে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা কয়েকজন শক্তিশালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও 'মুসলিম সংস্কৃতি' সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা যদি 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ,' ঢাকা (১৯৪২ খ্রীঃ) এবং 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ

সোসাইটি,' কলিকাতা (১৯৪২ খ্রীঃ) নামক এই সময়কার দুটো বিখ্যাত সংস্থার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো এর সঙ্গে যুক্ত লেখক ও শিল্পীদের চিন্তার স্বচ্ছতার কতটা অভাব ছিল। এইভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দ্বি জাতিতত্ত্বের প্রতিফলন আমরা পেলাম দেশভাগের মধ্য দিয়ে।

বলতে দ্বিধা নেই, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেদিন যেসব ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের ইতিহাস চেতনা স্বচ্ছ ছিল না। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি, জীবনের একটি স্বাভাবিক আবেগ ও গতি রয়েছে, অনেক সময় অন্য কোন অবলম্বন না থাকলে তা মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই প্রবাহিত হয়। তাঁরা একথাও বুঝতে চেষ্টা করেননি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাঙালী মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষার যে চর্চা শুরু হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই আমরা যার দ্রুত অগ্রগতি দেখতে পাই, তার মধ্যেই নিহিত আছে এক প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর গতিবেগ, যার প্রবাহ যে কোন সময় দুকূলপ্লাবী হয়ে সব আবিলতা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাতৃভাষার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করে, অনুভূতিগুলোকে স্বাভাবিক করে, আর তার মধ্য দিয়েই যুক্তিশীল মানবিক বোধ প্রখর হয়ে ওঠে। ধীর মন্থর গতিতে হলেও বাংলা ভাষার মত একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যময়ী ভাষার চর্চা বাঙালী মুসলিম সমাজকে রূপান্তরিত করতে থাকে। ইসলামী স্বজাত্যবোধের রাজনৈতিক উত্তেজনায় তার প্রভাব চাপা পড়লেও মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে যুক্তিশীল মানবিক ভাবধারাটি বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রবহমান ছিল। দেশভাগের কয়েক মাস পরে তারই স্রোতধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম ঢাকার ময়দানে। তারপর এলো একুশে ফেব্রুয়ারির জাগরণ।

'বুদ্ধির মুক্তি'র আন্দোলন এই ভাষা আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সমাজ-

তান্ত্রিক ভাবধারাসমূহ একই মোহনায় মিলিত হওয়ায় এই আন্দোলন গণজাগরণে পরিণত হয়। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারাটি বিপর্যস্ত হয়। এক নতুন সমাজ গড়নের সূচনা হয় তখন থেকেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়। তার ফলে নদীমাতৃক দেশ পলিমাটির পুরু স্তরে ঢাকা পড়ে গেল। সে মাটিতে অগণিত জানা-অজানা বীরেরা যে ত্যাগ ও শৌর্যের বীজ বপন করলেন তাতে বাংলাদেশ নামক এক বৃহৎ বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, ফুলে-ফলে সজ্জিত হয়ে আপন মহিমা ঘোষণা করে বাঙালী জাতির নবজন্মের প্রতীকরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সাময়িক ঝড়ে এই বৃক্ষটি ক্ষতবিক্ষত হলেও তার শিকড় জাতীয় জীবনের এত গভীরে প্রোথিত যে একে উপড়ে ফেলা কারো সাধ্য নয়। এর শিকড় থেকেই বারে বারে শ্যামল ছায়া ঘন পত্র-পুষ্পে আচ্ছাদিত বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। একুশে ফেব্রুয়ারি এ প্রত্যয় নিয়ে এ বছরও আমার কাছে দেখা দেয়।

ডঃ সিরাজুল ইসলাম রচিত 'শেরে বাংলার পুণর্মূল্যায়ন' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

মাত্র কয়েকদিন আগে 'বিচিত্রা'র ৯ মে ১৯৮০ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম লিখিত 'শেরে বাংলার পুণর্মূল্যায়ন' প্রবন্ধটি পড়বার সৌভাগ্য আমার হল। এই তথ্যনির্ভর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য ডঃ ইসলামকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর রচনা পাঠ করে মনে হল, সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিশীল মননধারা বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। ডঃ ইসলাম যে এই ধারাটির এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা এই প্রবন্ধটি তারই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে, ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, কোন বিতর্ক অবতারণা করার জন্য নয়, কয়েকটি কথা এখানে নিবেদন করছি।

ডঃ ইসলাম স্পষ্টভাবেই বলেছেন, আবুল কাশেম ফজলুল হক 'কিংবদন্তীর' নায়ক নন, তিনি 'ঐতিহাসিক চরিত্র'। এই মন্তব্যের সঙ্গে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে 'শেরে বাংলা' পদবীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। সমসাময়িক মুসলমান জনসমষ্টির রাজনৈতিক ভাবাবেগের সঙ্গে এই পদবীর কতটা সাযুজ্য আছে তার প্রতি কোনই গুরুত্ব ডঃ ইসলাম দেননি। 'শের' শব্দের অর্থ বাঘ বা সিংহ। তাদের স্বাভাবিক বৃত্তিও আমাদের জানা আছে। তবুও মানুষ কি এই পরাক্রান্ত জন্তুদের কেবলমাত্র হিংস্রতার প্রতীকরূপেই মনে করে? শ্যামল বনরাজির মাঝে তাদের তেজো-দীপ্ত ভঙ্গিমা কি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে না? ডঃ ইসলাম বাঘকে, 'রক্ত পিপাসু পশু', আর 'স্বেচ্ছাচারী রাজার প্রতীক' মনে

করে ফজলুল হক চরিত্রের যে রূপ দান করার চেষ্টা করেছেন তা অনেকের নিকটই একপেশে, সঙ্গতিহীন মনে হবে। তাছাড়া তাঁর আর একটি মন্তব্যও ইতিহাস সম্মত নয়। তিনি বলেছেন যাঁরা ফজলুল হককে 'শেরে বাংলা' পদবী দেন তাঁরা "এমন অঞ্চলের লোক যেখানে হিংস্রতা শ্রদ্ধা কুড়ায়।" এইভাবে কোন এক বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা কি যুক্তি-সঙ্গত? হিংস্রতা কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। সমাজের বৈষম্য, অবিচার ও আরও নানা কারণে হিংস্রতার উদ্ভব। মানব জীবনে হিংস্রতার উৎস সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই পণ্ডিতরা করেছেন। তার ফলে সমাজ জীবনের ও মানব চরিত্রের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ অনেকটা সহজ হয়েছে। ডঃ ইসলাম যদি কি পটভূমিতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ শহরের মুসলমান অধিবাসীরা মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হককে 'শের-ই-বঙ্গাল' পদবীতে ভূষিত করেন এবং যা পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরের লীগ অধিবেশনে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্বন্ধে মূল প্রস্তাব (যা চলিত কথায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত) উত্থাপন করার সময়ে উচ্চারিত হয়, তা মনে রাখতেন তা হলে এই 'পদবী' নিয়ে আলোচনা যথার্থ হত। তিনি এই কথা মনে রাখেননি, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একান্তভাবে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটিই ছিল ফজলুল হকের নিকটে মুখ্য বিষয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকে ফলপ্রসু করার জন্য তিনি প্রয়াসী হন। ভারতের মুসলিম রাজনীতির ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা জানেন এক প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ মুসলিম লীগ রাজনীতির মূল নিয়ামক ছিল। অবশ্য তার ঐতিহাসিক কারণ ছিল। তার সঙ্গেও গবেষকেরা পরিচিত। সেদিন অনগ্রসর মুসলিম সমাজের ক্ষোভের বিষয়বস্তুকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করবেন না। ফজলুল হক তা করতে পেরেছিলেন বলেই মুসলমান জনসাধারণ তাঁকে

এই পদবীতে ভূষিত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু সমাজের সামনে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বাঘের বা সিংহের মত এক পরাক্রমশালী নেতার। আর তেজস্বী ব্যক্তিই তো পৌরুষবিশিষ্ট, যিনি কোন অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। ফজলুল হকের মধ্যে এই তেজোময় রূপ দেখে সেকালের মুসলিম জনসমষ্টি তাঁকে 'শেরে বাংলা' পদবীতে বরণ করেন। ভালবাসার 'আতিশয্য' থাকলেও মুসলিম সমাজের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই ভাবাবেগ শক্তি সঞ্চয় করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। আমাদের দেশে বাঘ বা সিংহকে শক্তি বা তেজের প্রতীকরূপে দেখার রেওয়াজ দীর্ঘকালের। লখনৌ ও লাহোরের মুসলমান জন-সমষ্টির রাজনৈতিক ভাবাবেগের মধ্যে তারই অণুরণন আমরা দেখতে পাই। একে হালকাভাবে 'সংস্কৃতি সম্মত' পদবী নয় মনে করা কতটা সঙ্গত তা ভাবতে হবে। একটু সতর্ক থাকলেই ডঃ ইসলাম দেখতে পেতেন, কেবলমাত্র অবাঙালী মুসলমানেরাই হককে 'ধূর্ত শিয়াল', 'গাদ্দার' বলেননি, লীগপন্থী বাঙালী মুসলমানেরাও বলেছেন।

ডঃ ইসলাম ফজলুল হকের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর উল্লেখ করে হক চরিত্রের অস্থিরতা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। অনেককাল আগে হক চরিত্রের এই দুর্বলতার কথা মুজফ্ফর আহ্মদ উল্লেখ করেছেন (দ্র কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, কলিকাতা ১৯৬৫)। কালিপদ বিশ্বাসও তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (দ্র যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়, কলিকাতা ১৯৬৬)। ফজলুল হক দল পরিবর্তন করেছেন, অথবা সরকারী চাকরির উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাও অজানা কোন তথ্য নয়। তাঁর অস্থির চিত্ততার জন্য তাঁর নিজের ও দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল : কি কারণে হক চরিত্রে পরস্পর

বিরোধী উপকরণের এক জটিল সংমিশ্রণ প্রকট হয়ে ওঠে? অন্যান্য মুসলমান রাজনীতিবিদ কি এই জটিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন? ডঃ ইসলাম এই সব প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করলে অনেক আলোকপাত করতে পারতেন। ঢাকায় সংরক্ষিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার ফাইল, কলকাতায় সংরক্ষিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহ, আইন-সভার কার্যবিবরণী ও সরকারী দলিলপত্র থেকে পরিষ্কার জানা যায় কি জটিল পরিস্থিতিতে হককে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কংগ্রেস সম্মত না হওয়ায় তাঁকে মুসলীম লীগ ও সাহেবদের উপর নির্ভর করে 'জগাখিচুরী' মন্ত্রীসভা গঠন করতে হয়। নাজিমউদ্দীন, আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দ্দী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকার এক স্বচ্ছ চিত্র তো 'আজাদ' পত্রিকার ফাইলে আজও পাওয়া যায়। মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরে লীগ-মন্ত্রীদের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের আচরণ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুসলিম রাজনীতি সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়নের অভাব এবং ফজলুল হক চরিত্রের অস্থিরতা-আবেগ প্রবণতা ১৯৩৭-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে তার ফলে হক একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক নেতারূপে প্রতিভাত হন, অন্যদিকে একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে উচ্চারিত তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে কার্য-করী করতে ব্যর্থ হন। মুসলিম লীগের স্ট্র্যাটেজি সহজেই হককে কক্ষচ্যুত করতে সমর্থ হয়। সম্প্রদায়গত স্বার্থ, জাতীয়তাবাদী স্বার্থ, বাঙালী স্বার্থ ও সর্বভারতীয় স্বার্থ—এর মধ্যে সুস্থিত পথ করে চলার জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, স্থৈর্য্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল তার অভাব হকের মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

এমন সময়ে হককে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় যখন জাতীয়তাবাদী স্বার্থের সঙ্গে সম্প্রদায়গত স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন করা সহজসাধ্য ছিল না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলামিক থিওক্রেসীর সামঞ্জস্য

সাধন কিভাবে করা সম্ভব, এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ চলতে থাকে। 'লখনৌ প্যাক্ট' (১৯১৬ খ্রী) এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। 'স্বরাজ' ও 'স্বধর্ম'—এই দুই আদর্শকে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে এক নতুন জাতি গঠনের নিরলস প্রচেষ্টা ডঃ ইসলাম উল্লিখিত সব নেতার মধ্যেই অনুপস্থিত ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আকরম খাঁর মুসলিম লীগ নেতায় রূপান্তর এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের তাত্ত্বিক নেতারূপে আবির্ভাব তো ইতিহাসের ছাত্ররা সবাই জানেন। তাঁরই মত মহম্মদ আলিও ১৯২০-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে ব্রতী হলেও পরে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। লীগ নেতা ও মন্ত্রী হিসাবে খাজা নাজিমউদ্দীন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রভৃতির কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এঁরা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধকে কতটা শক্তিশালী করেছিলেন এবং তার ফলে উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ভাবধারা কতটা বিপর্যস্ত হয়। অবশ্য তাঁরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষার নামেই এই স্বাতন্ত্র্যবাদী পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ফজলুল হকের কোন্ কোন্ বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল তা যদি ডঃ ইসলাম আলোচনা করতেন তাহলে হকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী পরিস্ফুট হত।

আর একটি তথ্যের প্রতিও ডঃ ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'স্বরাজ' ও 'স্বধর্ম—এই দুই আদর্শকে একই স্রোতধারায় প্রবহমান করার জন্য নিরলস প্রয়াস যে দুইজন মুসলমান নেতা করেন তাঁরা হলেন আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল গফ্ফর খান। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনের কয়েকদিন আগে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে আবুল কালাম আজাদ ভারতের জন্য এমন একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে মুসলমানদের স্বার্থ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত

রাখার ব্যবস্থা ছিল। সেদিন কিন্তু বাঙালী অবাঙালী সব লীগ নেতাই আজাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ডঃ ইসলাম যদি লাহোর অধিবেশন সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত সরকারী ফাইলটি দেখেন (দিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত) তাহলে দেখতে পাবেন 'গণতন্ত্র' বলতে তৎকালীন লীগ নেতারা সবাই 'সাম্প্রদায়িক স্বার্থই' বুঝতেন; আধুনিক গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোনই সঙ্গতি ছিল না। অভিজাত ও উচ্চশ্রেণী থেকে আগত নেতৃবৃন্দ এই পথকেই অর্থাৎ সম্প্রদায়গত স্বার্থকে পুঁজি করে এক পৃথক রাষ্ট্রে নিজেদের স্বার্থকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত মানসিক গড়ন সাম্প্রদায়িক না হলেও ঘটনার আবর্তে তাঁকে ১৯৩৭-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারারই প্রবক্তা হতে হয়। তৎকালীন রাজনীতির সমগ্র পটভূমি সামনে না রেখে ফজলুল হকের মত এক অসাধারণ প্রতিভাশালী, অস্থিরচিত্ত-আবেগপ্রবণ ব্যক্তির চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণ কখনই যথার্থ হতে পারে না। ডঃ ইসলামের প্রবন্ধে যুক্তির বিন্যাস এই পটভূমিতে রচিত হয়নি। তাই আসল হককে এখানে পাওয়া যায় না।

সুতরাং প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত: নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দীর মত ফজলুল হক কি স্বাতন্ত্র্যবাদী পথে মুসলমানদের মুক্তির ও উন্নতির পথকে একমাত্র উপায় মনে করে আঁকড়ে থাকেন? এই প্রশ্নের আলোচনা করলেই ডঃ ইসলাম অন্য সব লীগ নেতার সঙ্গে হক চরিত্রের পার্থক্য দেখতে পেতেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য যে 'লখনৌ চুক্তি' সম্পাদিত হয়, তাকে ডঃ ইসলাম 'অগণ-তান্ত্রিক অন্যায় চুক্তি' মনে করেন এবং এই চুক্তিকে সমর্থন করার জন্য তিনি ফজলুল হকের সমালোচনা করেন। এমনকি ডঃ ইসলামের এও মনে হয়েছে যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হক শুধু প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেননি, তিনি 'সার্বজনীন

গণতন্ত্রে'ও বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর প্রবন্ধের এই অংশে ডঃ ইসলাম তাঁদেরই সমর্থক যাঁরা ছিলেন 'লখনৌ চুক্তির' বিরোধী। তার ফলেই তাঁর পক্ষে এই চুক্তির তাৎপর্য ও হকের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে হক সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু স্বার্থকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বনিয়াদ রচনা করে সমগ্র জাতীয় সংহতিকে রূপদানের চেষ্টা করে-ছিলেন ; কিন্তু এই প্রয়াসকে ডঃ ইসলাম অগণতান্ত্রিক কাজ বলে মনে করেন। আমরা সবাই 'লখনৌ চুক্তির' ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন। এই চুক্তির মূল কথাই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। তবুও এই চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াস ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ডঃ ইসলাম নিজেও জানেন, এই সময়ে কংগ্রেস, লীগ, হোমরুলপন্থী কোন নেতাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করেননি। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীরাই শুধু কোন আপোস-পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দী পরিসমাপ্ত হওয়ার সময়কাল থেকেই বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে প্রচার করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 'স্বরাজ' শব্দকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের অর্থে তাঁরাই ব্যবহার করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁরা বলেন। অন্যদিকে কংগ্রেস, লীগ, হোমরুল-পন্থী নেতারা 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করার অর্থে। স্বভাবতই ফজলুল হক, যিনি কোনদিক থেকেই বিপ্লবী ছিলেন না, প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তার ফলে নিজের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয় এবং তা যে অনেকক্ষেত্রে সুবিধাবাদের নামান্তর ছিল সে বিষয়ে কোন মতান্তরের অবকাশ নেই! বিত্তশালী পরিবার থেকে আগত সব প্রভাবশালী নেতাদের চরিত্রে কি এই 'সুবিধাবাদ' লক্ষ্য করা যায়

না? ফজলুল হককে 'রাজভক্ত জোতদার সমিতির' নেতা বলে ডঃ ইসলাম বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর সঙ্গে এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক করার নেই। কিন্তু শ্রেণীগত অবস্থানের কথা তুলে ডঃ ইসলামের এই শব্দগুলো কি নাজিমউদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য লীগ নেতাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না? তাঁদের সম্পর্কেও তো একইভাবে বলা চলে, 'রাজভক্ত অভিজাত জমিদার-জোতদার-উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিনিধি।' সুতরাং ডঃ ইসলামকে অনুরোধ করব, তিনি যেন বিষয়টিকে শুধুমাত্র সম্প্রদায়গত স্বার্থের দিক থেকে না দেখে, তৎকালীন ভারতের অগ্রসর-অনগ্রসর সকল মানুষের অবস্থার ও ঐক্যের প্রশ্নগুলো সামনে রেখে, নেতাদের ও দলগুলোর শ্রেণীগত চরিত্র মনে রেখে, সেদিনকার রাজনৈতিক আবর্তের সামগ্রিক চিত্রটি বিশ্লেষণ করেন। তা হলেই আমরা দেখতে পাবো, সমগ্র জাতির সংহতির ও উন্নতির মূল প্রবাহকে শক্তিশালী করার পক্ষে সহায়ক ছিলেন কোন্ কোন্ লীগ নেতা ও কোন্ কোন্ সময়ে। তার ফলে আমরা খাঁটি স্বাতন্ত্র্যবাদী নাজিমউদ্দীন-সোহরাওয়ার্দী ও 'অস্থিরচিত্ত', 'সার্বজনীন গণতন্ত্রে' অবিশ্বাসী হকের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাবো। ডঃ ইসলাম এই কথাও মনে রাখেননি, ঔপনিবেশিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বাঙালী মুসলমান, সমগ্র বাঙালী জাতি ও ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে হককে বিচার করতে হয়েছে। আর এই কারণেই হককে কখনও সংখ্যাগুরু, আবার কখনও সংখ্যালঘু জনসমষ্টির কথা ভাবতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে কোন আদর্শস্থানীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কতটা সম্ভবপর ছিল? পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নটির সঙ্গে মৌলিক ভূমি সংস্কারের ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়গুলিকে একত্রীভূত করে হিন্দু মুসলিম মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এক নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু শ্রেণীগত অবস্থানের

জন্যই কংগ্রেস ও লীগ নেতারা এই পথে চলতে পারেননি। হকও তা পারেননি।

ফজলুল হকের সঙ্গে নাজিমউদ্দীন, সোহরাওয়ার্দ্দীর বা অন্যান্য লীগ নেতাদের মৌলিক পার্থক্য কোথায় ছিল তার আরও কয়েকটি দিক এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের হক জীবনী বাদ দিয়ে হক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কি করে সম্ভব? ডঃ ইসলাম ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হকের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল সামনে রেখে হক চরিত্রের আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সময়ে (১৯৪১-১৯৪৩ খ্রী) হক দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়ে ডঃ ইসলাম একেবারে নীরব থেকেছেন। জমিদারী প্রথার অবসান না ঘটাতে পারার জন্য, অথবা শিক্ষা বিস্তারে ব্যর্থতার জন্য তিনি হকের সমালোচনা করেছেন। আমরা পূর্বেই শ্রেণীগত দিক থেকে হকের অবস্থান ও তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি। তার কথা মনে রেখেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে হকের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। প্রথমে ডঃ ইসলামের রচনা থেকে দুটো লাইন উদ্ধৃত করছি: প্রজা পার্টির "বারদফার মানিফেষ্টোতে এক দফাও গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে ছিল না। প্রায় সব দফাই ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে। বিশেষ করে জমিদার প্রজা সম্পর্কে।" ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক প্রজা সমিতির নির্বাচনী ইস্তাহারে এই সমিতির আদর্শ ও কর্মসূচী সন্নিবিষ্ট করা ছিল। তার সবটাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আমার লিখিত 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করা আছে। এই ইস্তাহারটি পাঠ করলে ডঃ ইসলাম দেখতে পাবেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে

অভিজ্ঞ ফজলুল হকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা যথেষ্ট স্বচ্ছ ছিল। প্রসঙ্গত আর একটি তথ্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে হক ভারতের দুঃখ-বেদনার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি এই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তের রচনাবলীর দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হন। হক যে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অযোগ্য ছাত্র ছিলেন না তা তাঁর ভাষণ থেকেই বোঝা যায়। তারই প্রকাশ ঘটে কৃষক প্রজা সমিতির দলিলে ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী ইস্তাহারে। ঐ ইস্তাহারটি ছিল হকের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তার মূল্যবান দলিল। অবশ্য সেকালের মাপকাঠিতেই তাঁর চিন্তাকে দেখতে হবে। এই ইস্তাহারে উল্লিখিত কর্মসূচী হক বাস্তবে কার্যকরী কেন করতে পারেননি, তা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব। যেহেতু আমার গ্রন্থে হক প্রচারিত ইস্তাহারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছি, এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। 'বিচিত্রা' কাগজের উৎসাহী পাঠকেরা তা দেখতে পারেন। মজার কথা হল, হকের প্রভাব থেকে মুসলমান জনসাধারণকে মুক্ত রাখার জন্য মুসলিম লীগও তাদের ইস্তাহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবি করেন। এই দুটো ইস্তাহার নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে লীগের নেতৃস্থানীয় নবাব-জমিদারদের ভূমিকা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। তখন মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড হকের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেন তার সঙ্গে ডঃ ইসলামের মন্তব্যের মিল কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। গবেষকদের লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব। আমরা কি করে ভুলতে পারি, এই সময়ে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে হক খুবই জোড়ালো ভাবে গ্রাম বাংলার কৃষকদের ও দরিদ্র মানুষদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যদিও তিনি জমিদারী প্রথার

অবসান ঘটাতে পারেননি, তাহলেও এই শ্লোগানকে তো তিনিই তখন গ্রামের নিরন্ন কৃষকদের মুখের ভাষায় পরিণত করেছেন। এই কারণেই কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত কৃষক-সভা নির্বাচনে হক ও তাঁর কৃষক প্রজা সমিতিকে সমর্থন করে। কংগ্রেস, লীগ, কৃষক প্রজা সমিতি ইত্যাদি দলগুলির মধ্যে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর এত প্রভাব ছিল যে হকের পক্ষে আর বেশীদূর এগুনো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে, বিদেশী শাসকদেরই সৃষ্ট জমিদার-জোতদার শ্রেণীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা, মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। এই কথাও মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বন্ধ্যানীতির ফলেই হক এক 'জগাখিচুরি' মন্ত্রীসভা গড়তে বাধ্য হন, আর এই মন্ত্রীসভার লীগ সদস্যরা নানাভাবে হককে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করেন। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হক কৃষক-প্রজার দুরবস্থা লাঘবে প্রজাস্বত্ব আইনের যেসব সংশোধন করেন ও মহাজনদের যেভাবে সংযত করেন, 'পর্বতের মুষিক প্রসব' বলে এর গুরুত্ব অগ্রাহ্য করা কতটা সঙ্গত তা আমাদের ভাবতে হবে। ডঃ ইসলাম কি এই তথ্য অস্বীকার করতে পারেন যে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে প্রজা-স্বত্ব আইনের সংশোধনী বিল পাশ হয় তাতে জমিদার স্বার্থের পরিপন্থী, প্রজা স্বার্থের অনুকূলে কয়েকটি ধারা ছিল, আর সেই কারণে ইংরেজ গবর্ণর বিলে তাঁর অনুমোদন দিয়ে তাকে পাকা আইনে পরিণত করতে বিলম্ব করেছিলেন? এই বিলে কৃষক সভার সব দাবি নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া হয়নি, তা সত্ত্বেও হকের সমালোচক কৃষকসভা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি যে এই বিল রাইয়তদের পক্ষে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল: এই কারণে কৃষক সভা এই বিলকে সমর্থন করে এবং অবিলম্বে আইনে পরিণত করার দাবি করে, নইলে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলে। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার প্রকাশ্যভাবে এই আশ্বাস দেন যে দু মাসের মধ্যে এই বিল তাঁরা

আইনে পরিণত করবেন। অবশেষে আগস্ট মাসে তা আইনে পরিণত হয়। ডঃ ইসলাম যদি খোঁজ নেন, তাহলে দেখতে পাবেন লীগ, প্রজা পার্টি ও কংগ্রেস প্রভৃতি দলের জমিদার-জোতদারের ও ইংরাজদের বিরোধিতার ফলে হককে এই বিল আইনে পরিণত করতে কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট কর্মীরা হকের কোন কোন বিশেষ কাজের কঠোর সমালোচক হলেও তাঁরা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের ফলে রাইয়তদের অনেকটা সুবিধা হলেও, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও উঠবন্দী প্রজাদের কোন সুবিধা এই আইনের দ্বারা হয়নি। ডঃ ইসলাম এই আইন সম্বন্ধে তৎকালীন কৃষকসভার মনোভাব মনে রাখলে হকের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারতেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঋণ-সালিশী বোর্ড আইন পাশ করার ব্যাপারে নাজিমউদ্দীনের ভূমিকা সম্বন্ধে ডঃ ইসলাম যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা নিয়ে মতান্তরের কারণ নেই। এই আইনের ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ ইসলাম লিখেছেন: "সর্বাধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে ঋণ সালিশী বোর্ডকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছে যত এর কার্য্যকারিতার ফলে দেশের সাধারণ লোকের উপকার হয়েছে অনেক কম।" এই মন্তব্য নিয়েও নিশ্চয়ই কেউ বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে জমিদার জোতদার-মহাজনদের ভূমিকার বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রজা লীগ মন্ত্রীসভার আমলে জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণী তাঁদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোন আইন কার্যকরী করতে চাননি তাই তাঁরা নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করেন। এখানে আমি সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই বিষয়টি উল্লেখ করছি। তা সত্ত্বেও তৎকালীন রাজনীতির সম্প্রদায়গত সম্পর্কের চিত্র মনে রেখে আর

একটি দিক থেকেও বিষয়টি দেখার কথা বলব। এই সময়ে মুসলমান জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণীর একটি বড় প্রভাবশালী অংশ মুসলিম লীগকে আশ্রয় করেই তাঁদের ক্ষমতার প্রসার ঘটান। মন্ত্রী, আইনসভার সদস্য, মুসলিম লীগ প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসন যন্ত্রের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। স্বভাবতই ঋণসালিসী আইনের যেসব ধারা বাস্তবিক সাধারণ কৃষকের উপকারে আসে তার পথে তাঁরা নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। তাঁদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। এইসব আইন সাধারণ কৃষকদের ও গরীব মানুষের মনে যে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে, যার ফলে হকের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা ছিল, তাতে লীগের নেতারা খুব শঙ্কিত হন। এই কারণে এইসব আইনের কল্যাণমুখী ধারাগুলিকে অপারগ করে দিয়ে তাঁরা হককে মুসলমান জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। এইসব নেতাই তো প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে ঋণ-সালিশী বোর্ডের অপারেশন এমন ভাবে করান যার ফলে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ধনী ও মাঝারী কৃষকেরা লাভ করেন। আর এই অংশই তো তখন মুসলিম লীগের মস্ত বড় সমর্থক ছিলেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে : ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় মহাজনী আইন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের চাষী আইনের সংশোধনী কি কৃষকদের দুরবস্থা লাঘবে কিছুটা সহায়ক ছিল না? আর এই দিক থেকে এইসব আইনকে কি সঠিক ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা যায় না? এই সব আইনে ডিক্রির টাকা কমাবার বা দেনার দায়ে জমি নিলাম রদ করবার ক্ষেত্রে ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়। আমরা জানি, তখন কৃষক সভা আমূল ভূমিসংস্কারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। তা হলেও কৃষকসভা এইসব আইনের যে সব ধারা কৃষকের পক্ষে সহায়ক ছিল তা কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট ছিল। কৃষকসভা

কিন্তু ডঃ ইসলামের মত এই রকম সিদ্ধান্ত করেননি যে, ঋণ-সালিশী বোর্ড আইনের ফলে দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের একটি কারণও হল এই বিধি ব্যবস্থা। তাহলে কি আমাদের এই কথা মনে করতে হবে যে ঋণ-সালিশী সংক্রান্ত আইন পাশ হবার পর গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষের মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তার কোন ভিত্তি নেই? ডঃ ইসলামের রচনায় তার কোন উল্লেখ নেই। নিশ্চয়ই 'সর্বাধুনিক গবেষণায়', যে সব নতুন তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, প্রচলিত ধারণাগুলিও পাল্টাতে হবে। কিন্তু এইসব গবেষণায় বাঙালী মুসলিম সমাজে জমির সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী অংশের (জমিদার, জোতদার প্রভৃতি) অবস্থান, দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের উপর তাঁদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস, আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে লীগের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জেলা বা অঞ্চল ভিত্তিক কোন বিস্তৃত আলোচনা এখনও হয়নি। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ন নিয়েও পর্যালোচনা হয়নি। বাঙালী মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে কারা হকের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন।

ডঃ ইসলাম আর একটি বিষয়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তা হল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা। এর ব্যর্থতা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তাই বলে ক্রেডিট-সোসাইটির ব্যবস্থা ক্ষতি-কারক হয়েছে এই রকম সিদ্ধান্ত করা কি সম্ভব হবে? সেই রকমই ঋণ-সালিশী বোর্ডের অপারেশনের ত্রুটির কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই ব্যবস্থাটাকেই ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করা কতটা সম্ভব তা ভাবতে হবে।

এবার আসা যাক, সর্বাধুনিক গবেষণার দাবির বিষয়ে। আমরা কৃষক সভার কথা উল্লেখ করেছি। কৃষক সভার দলিলপত্র নতুন গবেষণায় স্থান পেয়েছে বলে চোখে পড়েনি। প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, মহাজনী ব্যবস্থা, পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক পত্র-পুস্তিকা কৃষক সভা প্রকাশ করে। কৃষকের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই এইগুলি রচিত। সুতরাং নতুন গবেষণায় কৃষক সভার মতামতের পর্যালোচনা থাকা উচিত। তাহলে দেখা যাবে কৃষক সভা সর্বাধুনিক গবেষণার আগে কতটা এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছে। এমনকি আমরা দেখতে পাই, জমিদারের পক্ষে কলম ধরে একজন জমিদারও সর্বাধুনিক গবেষণার বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী লিখিত Permanent Settlement and After গ্রন্থে Debt Conciliation Act সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্র কিশোর বলেছেন, মহাজনী প্রথা সম্বন্ধীয় আইনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ঋণ দেবার জন্য কোন সুব্যবস্থা না করতে পারার ফলেই কৃষকদের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। আমি জানি, ডঃ ইসলাম ও আরও কয়েকজন গবেষক ভূমি সমস্যা সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁদের আমি অনুরোধ করব, তাঁরা যেন তৎকালীন আমলের এইসব তথ্যগুলি পর্যালোচনা করে আমাদের চিন্তাকে উন্নীত করেন।

ডঃ ইসলাম ১৯২৬ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা উল্লেখ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অসঙ্গত আচরণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য দিয়েছেন তা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নেই। ডঃ ইসলাম হককে "সে যুগের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা-দরদী" বলতে রাজী নন। তা ছাড়া "শিক্ষার ব্যাপারে হকের কোন নির্দিষ্ট দর্শন বা নীতি" ছিল বলে তিনি মনে করেন না। তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, হকের কোন 'জাতীয় শিক্ষা নীতি' বা 'নির্দিষ্ট দর্শন' ছিল না। তাছাড়া তিনি এও মনে

করেন মাত্র দু-তিনটি কলেজ স্থাপন করে কি করে হক এতটা গৌরবের দাবি করতে পারেন ? ডঃ ইসলাম একটা কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হক তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গ্রাম বাংলায় অসংখ্য সভা-সমাবেশের মাধ্যমে যে জনমত তৈরি করেন তার ফলে মুসলিম সমাজে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর এই সময়েই তো বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকটা প্রসারিত ও সংহত রূপ ধারণ করে। সংখ্যার দিক থেকে হক কয়টা কলেজ স্থাপন করেছিলেন, এই হিসেব দিয়ে কিন্তু এই জাগরণকে চিহ্নিত করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তো একটাই 'হিন্দু কলেজ' ছিল। হিন্দুসমাজের জাগরণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কি কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেন ? ইসলামিয়া কলেজের বা ব্রাবোর্ণ কলেজের পরিকল্পনা হকের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আগে হলেও, হকের মন্ত্রীত্বকালে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের কি তিনি এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যা অর্জনে উৎসাহিত করেন নি ? ১৯৩৭-১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সময়ে বাঙালী মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবীদের যে অংশটি বিকশিত হয়, যাঁরা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কি ডঃ ইসলাম পর্যালোচনা করে দেখেছেন ? হক তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে যেসব কথা বলতেন তার মূল কথাই ছিল বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা দূর করা এবং জাগতিক দিক থেকে লাভবান হওয়া। 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বা 'নির্দিষ্ট দর্শন' বলতে যা আমরা বুঝি তা নিশ্চয়ই হকের ছিল না। অন্য কোন মুসলমান নেতা সেই সময়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতির' ব্লু-প্রিণ্ট রচনা করেছিলেন কিনা তা ডঃ ইসলাম উল্লেখ করলে আমরা উপকৃত হতাম। আর ডঃ ইসলাম এখানে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' ও 'নির্দিষ্ট দর্শন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা ব্যাখ্যা করলেও

ভাল হত। আমরা ধরে নিতে পারি ডঃ ইসলাম এখানে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বলতে বাংলার অথবা ভারতের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অধিবাসীদের কথা মনে রেখেছেন। আর ডঃ ইসলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে 'নির্দিষ্ট দর্শন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তাও ব্যাখ্যা করেননি। আমরা কি ধরে নিতে পারি, ডঃ ইসলাম উদার-মানবিক ভাবধারাকে ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার সৌধ নির্মাণের কথা ভেবেছেন? আর তাই যদি হয় তাহলে নাজিমউদ্দীন বা অন্য কোন লীগ নেতা কি এই ধরণের সৌধ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন? ডঃ ইসলাম বিক্ষিপ্তভাবে হককে সমালোচনা করতে গিয়ে এইসব শব্দ চয়ন করেছেন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করে। আমার কিন্তু মনে হয়, তৎকালীন মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই অনগ্রসর মুসলিম সমাজের উন্নতির কথা ভেবেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি করেছেন, হকও তাই করেছেন। তবে নাজিমউদ্দীন, আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দী প্রভৃতি লীগ নেতাদের সঙ্গে হকের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য যেখানে ছিল সেকথাই এবার উল্লেখ করে এই রচনাটি শেষ করব।

ডঃ ইসলাম হকের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেন যে তিনি উল্লেখ করেননি, তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'সর্বাধুনিক গবেষণায়' তো এই বিষয়টিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা উচিত নয়। আমি এখানে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' সম্বন্ধে ফজলুল হক ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দ কি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তার এক তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রতি বাংলাদেশের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয় নিয়ে বাংলায় ও ইংরেজিতে আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি এবং তা ভারতের বিভিন্ন গবেষণা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করে কয়েকটি কথা বলছি। ১৯৪০

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপন করার পরেই হক তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং তারপর একটানা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি কখনই মনেপ্রাণে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' গ্রহণ করতে পারেননি। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করার পর থেকেই হককে মুসলিম লীগ পন্থীরা 'গাদ্দার' (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক) বলতে থাকেন। তখন থেকেই হকের রাজনৈতিক চিন্তার মুখ্য বিষয় ছিল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' যে সমগ্র বাঙালী জীবনে ভয়ানক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু দেশভাগকে রোধ করবার মত কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবুও দেশভাগের প্রাক্কালে বাঙালী জাতিকে এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু মুসলিম মিলিত প্রয়াসে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়বার কথা বলেন। এক ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের মাঝে দাঁড়িয়েও তিনি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন, "যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করছেন তাঁরা ইসলামের শত্রু এবং তাঁদের দ্বারা মুসলমানদের প্ররোচিত হওয়া উচিত নয়।"

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট বরিশাল শহরের অশ্বিনীকুমার হলে এক বৃহৎ হিন্দু-মুসলিম জনসভায় ফজলুল হক যে ভাষণ দেন তাতে গবেষকেরা দেখতে পাবেন বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ হক তখনও কতটা তেজোময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেদিন নিঃসঙ্গ হলেও, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রবল প্রবহমান স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে, তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেননি। হক খাঁটি মুসলমান ছিলেন, আবার একই সঙ্গে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। এই হক এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসংখ্য ত্রুটি ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলার আপামর জনসাধারণ তাঁকে তাঁদের খুব কাছের মানুষ বলেই মনে করতেন। নিজধর্মের প্রতি আস্থাশীল থেকেও যে প্রতিবেশীকে একান্ত আপনজন বলে ভাবতে

পারেন এমন মানুষকেই তো গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ তাঁদের আপনজন বলে বরণ করেন। এইখানেই হকের সাফল্য। সেদিন তো আর অন্য কোন বাঙালী মুসলমান নেতার মধ্যে এই ধরণের অসাধারণ গুণের সমাবেশ .দখা যায়নি। তাই হককে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ আজও রয়েছে। এতো খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জীবনে যে অস্থিরতা প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনকে বিষণ্ণ করছে তা থেকে মুক্তিলাভের আশায় মানুষ সেই জননেতার দিকে তাকায় যিনি খাঁটি মুসলমান হয়েও খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাঙালী মনের এই স্বাভাবিক আকুলতার সঙ্গে যিনি জড়িয়ে আছেন তাঁকে কি ইচ্ছে করলেই ভোলা যায়?

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডঃ ইসলাম যে সময়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন তখন ভারতায় জীবনের সংঘাতের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম দুটো হল: (ক) সর্বভারতীয় সত্তার সঙ্গে আঞ্চলিক সত্তার বিরোধ, আর (খ) হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। গবেষকদের দেখতে হবে এই বিরোধ-সংঘাতকে হ্রাস করে মিলনের সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করে গণতান্ত্রিক মানবিক বোধকে ভিত্তি করে এক নতুন ভারতীয় জীবন গড়বার প্রয়াসে কোন্ কোন্ নেতা উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ফজলুল হকের সঙ্গে অন্যান্য লীগ নেতাদের মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবো। আমরা দেখতে পাবো, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালীজাতির আবেগ-অনুভূতি হকের অস্থিরতা-আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলেই তাঁর নাম আজও সাধারণ মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। ভবিষ্যতেও করবে।

[রচনার সময় ১৪. ৮. ৮০]

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলোর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সাঁওতাল কৃষকদের সংগ্রাম এরই একটা গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায়। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল অনেকবার। প্রথমে ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ ও ১৮৫৫-৫৬ সালে, এবং পরে ১৮৭১, ১৮৪৪-৭৫ ও ১৮৮০-৮১ সালে। এর মধ্যে ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহ ছিল সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপক।

বিদ্রোহের পটভূমিকাঃ বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের সামাজিক-আর্থিক জীবনের গোটা কাঠামোর ভিত্তিমূলকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত জমিদারী ব্যবস্থা (১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত), রাজস্বের পর্ব্বত প্রমাণ চাহিদা ও বিচারাদালত ঘটিত পদ্ধতি ভারতের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার আকৃতি সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। কৃষিতে জমিদার, মহাজন, ব্যাপারী প্রভৃতি নূতন শ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটে।

বৃটিশ শাসনের পূর্বে জমিতে কৃষকের যে অধিকার ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়। রাজস্বের পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। শোষণ ও পীড়নের এই নূতন বনিয়াদ ভারতের কৃষিতে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। তাই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে গ্রেট বৃটেন থেকে সস্তায় শিল্পজাত দ্রব্য আমদানীর ফলে ভারতের কুটির শিল্পও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নিঃস্ব কুটিরশিল্পীরা ভূমিহীন দিনমজুর অথবা ভাগচাষীতে পরিণত হয়। দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আঠারো শতকের শেষের দিকে বা উনিশ শতকের প্রারম্ভে একদিকে ইংরেজ শাসন ও জমিদার, মহাজন, ব্যাপারী প্রভৃতি নূতন শ্রেণী এবং অপরদিকে

ভূমিহীন ও নিঃস্ব কুটিরশিল্পীর আবির্ভাব—এই হলো ভারতের অবস্থা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই উনিশ শতকের সাঁওতাল বিদ্রোহ, তার শ্রেণী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা দরকার।

সাঁওতালরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একটা বড় উপজাতি বা খণ্ডজাতি। তাদের সমাজ ব্যবস্থ বাঙ্গালী বা বিহারীদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। কোন জাতিভেদ নেই এদের মধ্যে; সাতটি গণ বা গোষ্ঠীতে সমগ্র সাঁওতাল উপজাতি বিভক্ত। সকলেই সামাজিক দিক দিয়ে সমান। এইসব গোষ্ঠীর নিজস্ব নাম বা পদবী আছে। নিজস্ব ভাষা থাকলেও কোন বর্ণমালা না থাকায় এই ভাষা যেটুকু লেখা হয় তা বাংলা হিন্দী ইত্যাদি বর্ণমালার সাহায্যেই লেখা হয়। সাঁওতালদের মধ্যে তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী ও প্রবাদ প্রচলিত আছে।

সাঁওতালরা ছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয় কৃষক। চাষের পদ্ধতিও ছিল পুরাতন। জঙ্গল সাফ করা ও চাষের কাজে ছিল খুব দক্ষতা। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' সঙ্গে সঙ্গে যে সব জমিজমায় এরা বহুকাল থেকে চাষবাস করতো এবং অধিকার ছিল তা জমিদারের এক্তিয়ারে চলে যায়। জমির খাজনাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই নূতন ব্যবস্থা জটিলতার সৃষ্টি করে। শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা এর সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে কটক, ধলভূম, মানভূম, বরভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চল থেকে 'দামনে কোহ' (বর্তমান রাজমহল পাহাড়তলী) এলাকায় আসতে থাকে। এই অঞ্চল পড়ে তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে। তারা সেখানে এসে চাষবাস করতে থাকে এবং নূতন করে জীবন আরম্ভ করে। সেখানে প্রচুর উর্বরা জমি পতিত বা জঙ্গলে ঢাকা পড়ে ছিল। জমি পাবার লোভেই তারা এখানে এসেছিল পঁচিশ বছরে প্রায় একলাখ সাঁওতাল পাঁচলাখ বিঘা

জমি আবাদ করে। সাঁওতালদের ধারণা ছিল যে যারা জমি প্রথম চাষ করবে তাদেরই অধিকারে থাকবে জমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা গঙ্গার সমতল ভূমির সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যেখানে জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা বর্তমান ও খাজনাও ছিল অনেক উঁচুতে।

সুতরাং সাঁওতালরা 'দামনে কোহ' এলাকায় এসে বেশীদিন শান্তিপূর্ণভাবে চাষ করতে পারেনি। জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষযোগ্য করার পরই জমিদাররা এসে জমির উপর অধিকার ও খাজনা দাবী করে। মহেশপুর ও পাকুড়ের রাজারা অ-সাঁওতাল বাঙ্গালী জমিদার এবং আর্থিক উত্তমর্ণদের কাছে সাঁওতাল গ্রামগুলোর জমিজমা ঘরবাড়ী প্রভৃতির প্রজাবিলি করে। এজন্যে সাঁওতালরা মহেশপুর ও পাকুড়ের রাজাদের ঘৃণা করতো। উপরন্তু বাঙ্গালী ও ভাটিয়া ব্যাপারী ও মহাজনরা দামনে কোহ অঞ্চলে এসে তাদের কারবার আরম্ভ করে। সুদের কারবার ও ব্যবসায়ে এরা প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে। ফলে সাঁওতালদের জমিজমাও বেদখল হতে লাগলো। অন্যদিকে ব্যাপারীরা নিতান্ত সস্তাদরে সাঁওতালদের ঠকিয়ে ফসল (চাল, সরিষা ইত্যাদি) কিনে বাইরে চালান দিত এবং চড়াদরে লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সাঁওতালদের কাছে বিক্রী করতো। সমসাময়িক একজন লেখক ঘটনাকে এইভাবে Calcutta Reviewতে প্রকাশ করেছেন—"Zamindars, the police, the revenue and court amlas have exercised a combined system of extortions, oppressive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the timid and yielding Santhals. Usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 percent ; false measures at the haut (weekly market) and the market ; wilful and uncharitable trespass by the

rich by means of their unfettered cattle, tattoos (small ponies), ponies and even elephants, on the growing crops of the poorer race ; and such like illegalities have been prevalent. Even a demand by individuals from the Santhals of security for good conduct is a thing not unknown ; embarrassing pledges for debt also formed another mode of oppression" (Calcutta Review, 1856). "The Santhal saw his crops, his cattle, even himself and family appropriated for debt which (though) ten times paid, remained an incubus upon him still" (Calcutta Review, 1860).

এ ছাড়া এ সময়ে এই অঞ্চল দিয়ে রেল লাইন তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়। যেসব ইংরেজ কর্মচারী এখানে কাজে নিযুক্ত ছিল তারা সাঁওতালদের জিনিষপত্র জোর জবরদস্তি করে কেড়ে নেওয়া, জুলুম ও খুনখারাপি করার সাথে সাথে কয়েকজন সাঁওতাল রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারও করে।

এমনি করে সরকারী আমলারা, জমিদার, মহাজন, ব্যাপারী ও ইউরোপীয়ানরা মিলে সাঁওতালদের জীবন দুবিসহ করে তোলে। সরকারী কাগজপত্রেও এই অত্যাচারের কাহিনী গোপন করা সম্ভব হয়নি। বৃটিশ শাসন এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য কোন আগ্রহ দেখায়নি। আদালত হতেও সাঁওতালরা কোন সাহায্য পেত না। বরং জমিদার মহাজনদের স্বার্থে পুলিস এসে তাদের ওপর অযথা হয়রান ও পীড়ন করতো।

এই অবস্থা ক্রমেই অসহ্য হয়ে নিরীহ, সরলপ্রাণ, পরিশ্রমী সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভের রূপ নিতে আরম্ভ করলো। মানুষ কেন যে অত্যাচার করে এরা না বুঝতে পারলেও অত্যাচারী লোক-

গুলো সম্পর্কে এবং তাদের যারা রক্ষা করে সেই পুলিস ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব দ্বিধাহীনভাবে সুস্পষ্ট হতে লাগলো। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের শেখালো যে সরকার জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীরা তাদের শত্রু।

সাঁওতাল কৃষকদের অভ্যুত্থান (১৮৫৫-৫৬) : এসব জুলুম ও শোষণ কি করে বন্ধ করা যায় তাই নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো। বিভিন্ন জায়গায় গোপনে বৈঠক বসতে থাকলো। নূতন চিন্তা ও চেতনা সাঁওতালদের মধ্যে জেগে উঠলো। সরকার ১৮১১ এবং ১৮৩১ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে কোনই অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। সুতরাং সাঁওতালদের অভাব অভিযোগ দূর করার সামান্যতম চেষ্টাও সরকারের তরফ থেকে হয়নি।

১৮৫৪ সালে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। লক্ষ্মীপুরে সাসানের পরগনাইত বীর সিং-এর নেতৃত্বে সাঁওতালদের একটা বড দল তৈরী হলো। বিভিন্ন গোপন বৈঠকে তারা এসে জড় হতে লাগলো। অন্যান্য বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের মধ্য ছিলেন বোরিওর বীর মাঝি, সিন্দ্রির কাওল পরামানিক ও হাতবাঁধার ডোমন মাঝি। মাতব্বরদের নেতৃত্বে সাঁওতালরা প্রতিশোধ হিসাবে অত্যাচারী ধনী জমিদার-মহাজনদেব বাড়ীতে ডাকাতি সুরু করলো। সমসাময়িক একজন লেখক Calcutta Review-তে লিখেছেন ' these were well merited reprisals for their unprovoked cruelties." সাঁওতাল কৃষকদের এইসব কার্যকলাপ এবং গোপন সভা ইত্যাদির খবর পেয়ে জমিদার, মহাজন, স্থানীয় সরকারী আমলারা ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা পুলিস ও পাকুড়রাজ এস্টেটে খবর দেয়। পাকুড় রাজের দেওয়ান জগবন্ধু রায় ছিল সই অঞ্চলের ঘৃণিত ব্যক্তি। দেওয়ান জমিদারী কাছারিতে বীর সিংকে ডেকে এনে মোটা টাকা জরিমানা করলো। বীর সিং নিজেকে নির্দোষ ও জরিমানার টাকা দেবার অক্ষমতার কথা বল্লে তাঁকে তাঁর

অনুগামীদের সামনেই নিষ্ঠুরভাবে জুতো পেটা করা হয় [Peasant Uprisings in India (1850 1900)—L. Natarajan, p. 21]. তাছাড়া কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্ত জমিদারের প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে গোচ্চো নামক একজন প্রভাবশালী সাঁওতাল ও তাঁর দলের অনেককে গ্রেপ্তার করে ও কঠোর শাস্তি দেয়। গোচ্চো অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন "We shall see how much twine could Daroga procure so as to fasten all the peaceful Santhals whom the wicked Daroga wanted to be sent up" (The Santhal Insurrection of 1855-57—Kalikinkar Dutta, p. 21). এসব কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ১৮৫৪ সালের সমাপ্তির সময় গোটা সাঁওতাল জাতি প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পথে পা বাড়াতে অগ্রসর হলো।

১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ হতে ছয় থেকে সাত হাজার সাঁওতাল দামনে কোহে জমা হলো। তাঁরা অভিযোগ করলো যে ডাকাতির জন্য তাঁদের সহকর্মীদের শাস্তি দেওয়া হলো অথচ যেসব জমিদার মহাজনদের অত্যাচার ও শোষনের ফলে তারা আইনভঙ্গ করেছে তাদের কোন শাস্তি দেওয়া হলো না। তাই শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা শোষণ, অত্যাচার, দুর্ব্যবহার ও অপমানের প্রতিকার করার জন্য বিদ্রোহের পথ বেছে নিল। এই সভার সিদ্ধান্ত শালের ডালকে প্রতীক করে সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সাঁওতালরা শালবৃক্ষকে একতার চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করতো। ঠিক তখনই মহেশ দারোগা একদিন সাতকাঠিয়া গ্রামে গিয়ে সাঁওতালদের গ্রেপ্তার করে ; আর নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে গাছে বেঁধে চাবুক মারে।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন রাত্রে (১২৬২ সালের আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) সিধু ও কানু নামে দুজন প্রভাবশালী সাঁওতালদের

গ্রাম ভগ্নাডিহিতে এক বিশাল জমায়েত হয়। চারশত সাঁওতাল গ্রামের প্রতিনিধি দশ হাজার সাঁওতাল এই সভাতে উপস্থিত ছিল। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অত্যাচার অনাচারের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য সবাইকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। সভার নির্দেশ অনুসারে সাঁওতালদের নেতৃবৃন্দ কির্তা, ভাদু, সন্নো ও সিধু গভর্ণমেণ্টকে, কমিশনারকে, ভাগলপুরের কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে, দীঘা ও রাজমহল থানার দারোগাদের এবং কয়েকজন জমিদার ও অন্যান্যকে চিঠি লিখলেন। জমিদারদের নামে লিখিত চিঠিগুলোতে পনেরো দিনের মধ্যে উত্তর চাওয়া হয়েছিলো। একেবারে চরমপত্র।

এসব চিঠিতে সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে সাঁওতালরা জমির জন্য কোন খাজনা দেবে না, প্রত্যেকেরই জমি চাষ করার স্বাধীনতা থাকবে; সাঁওতালদের সমস্ত ঋণ বাতিল করতে হবে; তাঁরা জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছেন; আর তাঁদের মুলুক দখল করে নিজেদের সরকার কায়েম করবেন (The Santhal Insurrection of 1855—K. K Dutta, pp 14, 16,). ভগ্নাডিহির এই সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত। অথচ তাঁরা অত্যন্ত পরিষ্কার করেই তাঁদের সিদ্ধান্ত ও সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউ চিঠিগুলোর জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না।

বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সাঁওতালরা এই বিদ্রোহে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের সহযোগিতা লাভ করে। কামার, কুমোর, তেলী, গোয়ালা, চামার, ভুঁইয়া, বাগদী, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে মোমিনরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যোগ না দিলেও সাঁওতালদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। ১৮৫৫ সালের ২৮শে জুলাই বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে ভাগলপুরের কমিশনারের লিখিত পত্রে তৎকালীন

পরিস্থিতির স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায় : "From all accounts it appears that the Santhals are led on and incited to act of oppression by the Goallahs (milk-men), telis (oilmen), and other castes who supply them with intelligence, beat their drums, direct their proceedings and act as their spies. These people as well as the lohars (black smiths) who make their arrows and axes ought to meet with condign punishment and be speedily included in any proclamation which Government may see fit to issue against the rebels" (Calcutta Review, 1856). জমিদার, মহাজন ও সরকারের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম সেই অঞ্চলের গরীব জনসাধারণকে মাতিয়ে তোলে। শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে অন্যান্য গরীব জনসাধারণের অবস্থার কোন পার্থক্য ছিল না।

অবস্থা যখন এমন একটা রূপ নিয়েছে, তখন মহেশ দারোগা কয়েকজন বিদ্রোহী সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে। খাজনা জমিদারদের দেবার জন্য, শান্তভাবে চাষবাস করতেও তাদের উপদেশ দেয়। বিদ্রোহী কৃষকরা মহেশ দারোগাসহ ১৯ জনের মাথা কেটে ফেলে। পাঁচকাঠিয়া বাজারেও পাঁচজন অত্যাচারী মহাজন নিহত হয়। গোচ্চো কয়েক হাজার লোক নিয়ে খাঁপুর-বাহাদুরপুরের দিকে যান এবং সিধু, কানু আরেক বিরাট বাহিনী নিয়ে সুলতানবাদ দখলের জন্য মহেশপুরের দিকে অগ্রসর হন। জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীরা ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ী ফেলে পালাতে আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই বোরিও হতে কোহলগাঁও পর্যন্ত সমগ্র এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে আসে। তারপর বিদ্রোহীরা ভাগলপুর ও রাজমহলের দিকে অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলের ডাক ও রেল বন্ধ

হয়ে যায়। পিরপাঁইতি থেকে সকরিগলি পর্যন্ত সড়কও তারা দখল করে। কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে সাঁওতালদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিদ্রোহ বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলার বেশীর ভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে বিস্তৃত হয়।

পূর্ব থেকে কোন সংগঠন বা কোনরকম সামরিক শিক্ষা তাদের ছিল না। তবুও হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক গণবাহিনীর উপযুক্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে লড়াই করে। সুযোগমত গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিও তারা প্রয়োগ করতো। সাধারণতঃ ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়াতো। যুদ্ধের মাদলের শব্দ শোনামাত্রই সবই এক জায়গায় এসে জমায়েত হতো। অস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, কুঠার ও তলোয়ার। অবশ্য বিষাক্ত তীর তারা কখনও ব্যবহার করেনি। নেতাদের নির্দেশ ছিল যে ধনী জমিদার মহাজন ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধের এই পদ্ধতি ও নির্দেশনামাই বিদ্রোহীরা মেনে চলেছিলো।

অপরদিকে সরকারও চুপ করে থাকেনি। বিদ্রোহ দমন করতে যাবতীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করলো। ১৯শে জুলাই সামরিক আইন জারী করা হলো। যত সম্ভব সৈন্য গভর্ণমেণ্ট পাঠালো। ধনী জমিদার, মহাজন ও বিদেশী নীলকরেরা এই কাজে সর্বরকমে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দিল। মুর্শিদাবাদের নবাব বিদ্রোহ দমন করতে ৩০টি হাতী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাহলেও জুলাই মাসে অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীদের কাছে সরকারী সেনাদল পরাজিত হয়। লেফটেনাণ্ট টোলমেন ও ১৩ জন সিপাহী নিহত হয়। ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল সমগ্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। আর কামান বন্দুকসহ সুসজ্জিত ১৪ হাজার সৈন্য সরকার পক্ষে এই যুদ্ধে নামে। তবুও বিদ্রোহীদের আক্রমণের সামনে সৈন্যদলকে প্রথমদিকে হটতে বা পরাজয় বরণ করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত কামান বন্দুকের সামনে তীর ধনুক নিয়ে সাঁওতালরা

দাঁড়াতে পারে না। বিদ্রোহ দমনের নামে সৈন্যদল গণহত্যা ও সাঁওতাল গ্রামগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে। কাপ্তেন শেরবিল ১২টি ও মেজর শাকবরা ১৫টি গ্রাম ধ্বংস করে। ভগ্নাডিহি গ্রামও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তবুও দৃঢ়তার সঙ্গে দুর্জয় সাহস নিয়ে পিছু না হটে সাঁওতাল কৃষকেরা বীর বিক্রমে সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেয়। জুলাই ও আগষ্ট মাসে হাজার হাজার বিদ্রোহীর রক্তে রাজমহল অঞ্চলের মাটি লাল হয়ে যায়। সাঁওতালরা আত্মসমর্পণ করতে জানতো না। যতক্ষণ পর্যন্ত মাদল বাজবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে তারা লড়বে ও নিজেদের গুলি করে হত্যা করতে দেবে। বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত জনৈক ইংরেজ অফিসারের বিবৃতি থেকেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে —"On one occasion, the Santhals, 45 in number, took refuge in a mud house. The Magistrate called upon them to surrender, but the only reply was a shower of arrows from the half-opened door...I went up with my sepoys who cut a large hole through the wall. I told the rebels to surrender or I should fire in. The door again half-opened, and a volley of arrows was the answer. A company of sepoys advanced and fired through the hole. I once more called on the inmates to surrender... Again the door opened, and a volley of arrows replied. At every volley we offered quarter, and at last, as the discharge of arrows from the door slackened, I resolved to rush in...when we got inside, we found only one old man, dabbled with blood, standing erect among the corpses. One of my men went up to him, calling him to throw away

his arms. The old man rushed upon the sepoy, and hewed him down with his battle-axe" (cited by N. Kaviraj in "New Age", October 1954).

সাঁওতাল কৃষকেরা এই ধরণের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও শক্তিশালী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বেশীদিন পেরে উঠলো না। ধীরে ধীরে সৈন্যবাহিনী সাঁওতালদের ঘিরে ফেলতে থাকে। দশ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। কারো কারো মতে ১৫ হাজার সাঁওতালকে ইংরেজরা হত্যা করে। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কানু ও নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সাঁওতাল ধৃত হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়। সিধুকে ভগ্নাডিহিতে এর আগেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সমগ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করার জন্যে অনেক বিদ্রোহীদের উন্মুক্ত ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বন্দী হিসাবে ৫২ খানা গ্রামের ২৫১ জনের বিচার হয়। বন্দীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করতে সরকারকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। এদের মধ্যে সাঁওতাল ছিল ১৯১ জন, ন্যাস ৩৪, ডোম ৫, ধাঙ্গড় ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভুঁইয়া ৬, ও রাজোয়ার ১ জন। তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী ২৪৮ জনকে 'লুটের' অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এদের মধ্যে ৪৬ জন ছিল ৯ ১০ বছরের বালক। তাদের বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী সকলকে ৭ থেকে ১৪ বছরের মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। (সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী—আবদুল্লা রসুল, পৃঃ ২১)।

এই সংখ্যা এখনও অসম্পূর্ণ। সাঁওতাল পরগণার রেকর্ডস অফিসে সাঁওতাল বন্দীদের মামলার যে দুটো বড় ফাইল আছে তা প্রকাশিত হলে পর আমরা এই বিষয়ে অনেক বেশী তথ্য পাবো।

এত হত্যাকাণ্ডের পরও Friend of India ও Calcutta Review র সম্পাদকদ্বয় খুশি হতে পারেননি। জীবিত সাঁওতাল-

দের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেবার উপদেশ তাঁরা দেন।

সাঁওতাল কৃষকদের জমির দাবীতে ও শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিষ্ঠুর গণহত্যার ফলে পরাজয় বরণ করলো। বিদ্রোহের পর সরকার সাঁওতালদের একটা জাতীয় মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাজমহল এলাকাসহ বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণা জেলা গঠন করা হলো।

সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদলের শব্দ স্তব্ধ হলো। কিন্তু ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুনের রাত্রে ভগ্নাডিহি গ্রামের বিশাল জমায়েতে বিদ্রোহীরা যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলো তা দেশের বিভিন্ন জায়গায়—বাংলায় নীল চাষীদের বিদ্রোহে (১৮৬০), পাবনা ও বগুড়ার রায়ত অভ্যুত্থানে (১৮৭২), দাক্ষিণাত্যের মারাঠা কৃষকদের বিদ্রোহে (১৮৭৫-৭৬)—শুনতে পাওয়া গেলো। এরই ধারা বিংশ শতকে জমিদারী-মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষব্যাপী কৃষক জাগরণের সঙ্গে মিশে যায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান : বিদেশী প্রভুত্ব ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম স্তরে প্রধানত দুটো ধারা দেখতে পাওয়া যায়। একটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনের ভূমিকা। অপরটি কৃষক বিদ্রোহের ভূমিকা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনের ধারার নেতা। কৃষক বিদ্রোহের ধারাটি প্রকাশ পায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে। শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এ দুটো ধারাই বিদ্যমান ছিল। বিদেশী শাসন ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দুটো ধারাই ছিল প্রগতিশীল। যদিও প্রথম ধারাটির সঙ্গে দ্বিতীয় ধারাটি

প্রত্যক্ষভাবে মিলিত না হতে পারলেও এবং অনেক ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও, পরোক্ষভাবে ছিল পরস্পরের সহযোগী। কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা কৃষক বিদ্রোহের ধারাটি স্বীকার করতে চান না। বরঞ্চ অবহেলা ও অবজ্ঞা করেন। এই ধারাটিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়ভুক্তও মনে করেন না। সাঁওতাল বিদ্রোহের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা এসব ঐতিহাসিকের লেখায় স্থান পায় না। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের মহান ভূমিকাকে যথাযোগ্য স্থান দেবার জন্যই কৃষক বিদ্রোহগুলোর বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রয়োজন। আর তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের পতাকা বহনকারীরা শতবর্ষ পরেও সেই শক্তিশালী ও গৌরবময় সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

[পথের আলো, শারদীয়া সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১৩৬২, মুগকল্যাণ, হাওড়া]

নীল চাষের ইতিহাস

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে নীলের চাষ ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। নীল ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে পরিচিত। পুরাকালে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশ এর চাষ ও ব্যবহার জানতো কিনা সে সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্যাদি নেই। প্রাচীনকালের লেখকেরা এবং প্লিনি প্রভৃতি রোমক পণ্ডিতগণ 'ইণ্ডিকাম' নামে এর উল্লেখ করেছেন। নীলগাছের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Indigofera Tinctoria। প্রাচীন লেখকদের মতে এ নামের সঙ্গে ইন্দ বা হিন্দুস্তানের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এরই ইংরেজি নাম 'ইণ্ডিগো'। পরে অতিপ্রিয় রঞ্জক বস্তু ও বাণিজ্য দ্রব্য হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে নীলের ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নীল ভারতবর্ষের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। এমনকি প্রাচীন মিশরের মমির পরিচ্ছদে ভারতীয় নীলের ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। থিবসে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পুরানো যে পরিচ্ছদ পাওয়া গেছে তাতেও নীলের ব্যবহার রয়েছে। রঙ পাকা করার পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর বস্ত্রাদি রঞ্জনের প্রচেষ্টায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। দু'হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে রঙ পাকা করবার পদ্ধতির প্রচলন হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় নীলের বিশেষ চাহিদা ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ভারতীয় নীলের প্রচলন হয়। মধ্যযুগেও নীল ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। তখন আলেকজান্দ্রিয়া ও ভেনিস ছিল নীলের বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সময়ে পর্তুগীজ, ডাচ, স্পেনীয় ও ইংরেজ বণিকদের কাছে ভারতীয় নীল ছিল প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। ভারতীয়,

পারস্য দেশীয় ও আর্ম্মেনীয় প্রভৃতি এশীয় বণিকেরাও নীল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তীকালে আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারোলিনা ইত্যাদি অঞ্চলে নীলের প্রচলন হয়। তাছাড়া চীন, জাপান, জাভা, মাদাগাস্কার প্রভৃতি জায়গাতেও এর প্রচলন ছিল। অবশ্য ইওরোপীয় বণিকদের কাছে ভারতীয় নীলের চাহিদাই ছিল বেশী। ইওরোপের বস্ত্র শিল্পের জন্য নীলের বিশেষ প্রয়োজন। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীল ভারতবর্ষ থেকে চালান দিত। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকেরা নীলের ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল ছিল বলেই স্যার টমাস রো নীলকে 'প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ষোড়শ শতকে প্রধানত রপ্তানি করবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে নীলের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে ইওরোপে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার প্রয়োজনে ভারতীয় নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। স্বভাবতই নীল নিয়ে বণিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। আর নীলের ব্যবসা থেকে বণিকদের লাভও হয় প্রচুর। ঐ সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নীল উৎপন্ন হতো। প্রথম দিকে রপ্তানিকারকেরা দু অঞ্চলের নীলের সঙ্গেই পরিচিত ছিল, যথা—'বিয়ানা' এবং 'সারখেজ'। গুজরাটের সারখেজ, আমেদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি অঞ্চলের নীলের বাণিজ্যিক নাম ছিল 'সারখেজ'। আর বিয়ানা ও আগ্রা জেলার সন্নিকটস্থ নীল 'বিয়ানা' নামে পরিচিত। 'বিয়ানা' নীল অনেক সময়ে 'লাহোরি ইণ্ডিকো' নামে উল্লিখিত হতো। যেহেতু এ অঞ্চলের নীল স্থলপথে লাহোর দিয়ে ইউরোপে রপ্তানি করা হতো সেজন্যেই এ নামকরণ হয়। এই সময়ে বাংলাদেশে নীল উৎপন্ন হলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নীল উৎপাদনের দিক দিয়ে মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীলের দাম বেড়ে যায়। ভারতীয়

নীলের প্রধান ক্রেতা ছিল ডাচ ও ইংরেজ বণিকেরা। ইউরোপীয় বণিকেরা নীল ক্রয় করার জন্য অনেক পুঁজি নিয়োগ করে। ইংরেজ ও ডাচ বণিকেরা ভারতীয় কৃষকদের দাদন বা অগ্রিম অর্থ দিয়ে নীল ক্রয় করে। যথারীতি কৃষকদের কাছ থেকে নীল সংগ্রহ করবার জন্য ভারতীয় এজেন্ট নিযুক্ত করে। ফলে নীল উৎপাদনকারী কৃষকেরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সপ্তদশ শতকে ভারতে নীলের দাম কমানো এবং নীলের ব্যবসায়ে প্রাধান্য বিস্তার করবার অভিপ্রায়ে কোন কোন সময় ডাচ ও ইংরেজ বণিকেরা যুক্তভাবে চেষ্টা করে। অবশ্য এই যুক্ত প্রচেষ্টা খুবই সাময়িক ছিল। ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে নীলের ব্যবসা নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে পর্তুগীজ বণিকদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে ক্রমান্বয়ে ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে নীলের ব্যবসায়ে বেশী ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। বৃটিশ কোম্পানী ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে নীল প্রেরণ করতো। আবার লণ্ডন থেকে নীল ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি করা হতো। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ড ও ইউরোপের বাজারে ভারতীয় নীলের চাহিদা কমতে আরম্ভ করে। এর মূলে দুটো কারণ ছিলো। প্রথমতঃ ভারতীয় নীল প্রস্তুতকারকরা নীলে ভেজাল দিত। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ উপনিবেশকারীরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকাতে লাভজনক বলে নীলের চাষ শুরু করে এবং ভাল ধরণের নীল উৎপন্ন করে। তাছাড়া ফরাসী, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ উপনিবেশকারীরাও তাদের উপনিবেশে নীলের চাষ আরম্ভ করে। এই সমস্ত উপনিবেশে নীলের চাষে নিগ্রো দাসদের নিয়োগ করা হয়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের বাজারে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ও আমেরিকার নীলের চাহিদা খুবই বেড়ে যায়। উপরন্তু ডাচ বণিকেরা শ্যাম, জাভা ও ফরমোসা থেকে নীল ইউরোপের বাজারে প্রেরণ করে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে আধুনিক ধরনের বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ নৌবিভাগের পোষাক-পরিচ্ছদ নীল রঙে রঞ্জিত করবার জন্যও নীলের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যদিকে এই সময়ে জ্যামাইকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ নীলকরদের কাছে নীলের পরিবর্তে চিনি, তুলা ও কফিতে পুঁজি নিয়োগ বেশী লাভজনক হয়ে পড়ে। ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উক্ত অঞ্চলের বৃটিশ উপনিবেশকারীরা নীলের চাষ বন্ধ করে দেয় এবং চিনি, তুলা ও কফিতে পুঁজি নিয়োগ করে। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের ফলে আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে নীলের আমদানি স্বাভাবিক কারণেই ব্যাহত হয়। তখনও স্পেনীয় ও ফরাসী উপনিবেশে উন্নত ধরণের নীল উৎপন্ন হতো এবং ইউরোপের বাজারে প্রেরিত হতো। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে যখন ফরাসী উপনিবেশের, বিশেষ করে সেণ্ট ডোমিঙ্গোর, নিগ্রো দাসেরা মুক্ত হয় তখন থেকে ঐ অঞ্চলের নীলের ব্যবসার পতন ঘটে। আর এ যুগেই ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ভারতের নীল উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উন্নত ধরণের নীল প্রস্তুত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পুনরায় ভারতীয় নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

এই সময়ে বাংলাদেশ নীল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহুকাল ধরে বাংলাদেশে নীলতরু থেকে নীল প্রস্তুত করবার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহলেও এ নীল উন্নত ধরণের ছিল না। যথারীতি নীলবৃক্ষের চাষ ও নীলের উৎপাদন ইউরোপীয় নীলকরদের প্রচেষ্টার ফলেই সুরু হয়। ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে লুই বোনাড হচ্ছেন ভারতের প্রথম ইউরোপীয় নীলকর। ভারতে আসবার পূর্বে তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীলের ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং

নীল প্রস্তুত করবার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা এসে পৌঁছলেন। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অথবা আমেরিকার পদ্ধতি অনুসরণ করে বোনাড ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার তালডাঙ্গা নামক জায়গাতে নীলকুঠি স্থাপন করেন কিন্তু তালডাঙ্গাতে নীলকুঠির পক্ষে উপযোগী জমি সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি চন্দননগরের সন্নিহিত গোঁন্দল পাড়া নামক জায়গাতে চলে আসেন ও নীলকুঠি স্থাপন করেন। তৎসহ নীল প্রস্তুত করবার জন্য বৃহৎ কুণ্ড (কুণ্ডের ইতর নাম হৌজ) ইত্যাদি নির্মাণ করেন বোনাড-এর সমসাময়িক ক্যারেল ব্লুম নামক একজন নীলকর উল্লেখ করেছেন যে, '১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা আমেরিকার অনুকরণে এদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন'। আর এই ফরাসী ভদ্রলোকই হচ্ছেন বোনাড। এই ভাবেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নীল উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যারেল ব্লুম কলকাতা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে হুগলীর সন্নিকটে তঙ্কফল্লা তালুকে নীলকুঠি নির্মাণ করেন। এই কুঠি 'নীল ক্যাসল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ার কাছে আরও কয়েকটা নতুন নীলকুঠি নির্মিত হয়। হুগলী ও লাক্-সাগর অঞ্চলে নীলবৃক্ষের চাষও আরম্ভ হয়। ক্যারেল ব্লুম গবর্ণর জেনারেল কর্নওয়ালিশের নিকট যে স্মারক লিপি পাঠান তাতে এ দাবী করেন যে, তিনিই প্রথম বাংলাদেশে নীলের ব্যবসায় প্রচুর আয়ের পথ খুলে যেতে পারে সে সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সচেতন করান। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নীল চাষের উন্নতির জন্যও তিনি চেষ্টা করেন এবং এই নতুন রপ্তানী দ্রব্য সম্পর্কে মনোযোগী হন। তাছাড়া ব্লুম উল্লেখ করেন যে, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নীলকুঠি নির্মাণ করা, নীলচাষের জন্য কৃষকদের অগ্রিম দেওয়া ও নীল প্রস্তুত করা বাবদ তিনি মোট খরচ করেছেন চারলক্ষ সিক্কা টাকা। বিহারে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নীল প্রস্তুত করতে

আরম্ভ করেন ত্রিরহুতের কালেক্টর মিঃ এফ. গ্রাণ্ড। তিনি নিজের খরচে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি নীলকুঠি নির্মাণ করেন। অন্যদিকে পরবর্তীকালে বোনাড মালদহ, যশোর, খুলনা ও নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকুঠি নির্মাণ করেন। কিছু দুঃসাহসী ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কিছু কর্মচারী লাভজনক বলে নীলের ব্যবসায়ে পুঁজি নিয়োগ করতে আরম্ভ করেন। এইভাবেই বাংলাদেশে নীলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উৎকৃষ্ট ধরনের নীল প্রস্তুত করবার বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়।

এ উদ্দেশ্য নিয়েই বোর্ড অব ট্রেড ১৭৭৯ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জে. টি. প্রিন্সেপ নামক নীলকরের সঙ্গে নির্ধারিত মূল্যে নীল সরবরাহ করার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রিন্সেপ বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে নীল চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নীল ব্যবসা ছাড়া তাম্র খনিতেও তিনি পুঁজি নিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশে নীল চাষের প্রথম যুগে প্রিন্সেপের ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনুকরণে বাংলায় নীলকুঠি স্থাপন করেন এবং নীলচাষ সুরু করেন। বৃটিশ কোম্পানীর সাথে প্রিন্সেপের চুক্তি অনুসারে প্রতি মণ নীলের মূল্য ২২০ টাকা নির্ধারিত হয়। উদ্যোগী নীলকরকে সাহায্য দিয়ে বাংলায় নীলচাষের উন্নতি করাই ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এ কাজে কোম্পানী প্রিন্সেপকে একলক্ষ সত্তর হাজার টাকা অগ্রিম দেয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিন্সেপ ছিলেন নীল সরবরাহের একমাত্র কনট্রাক্টর। নীলের ব্যবসায়ে তিনি খুব লাভ করতে লাগলেন। তখনও চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে নীল উৎপন্ন হতো না। প্রিন্সেপ আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নীল সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া ভাল ও মন্দ নীল মিশিয়ে বাজারে ছাড়তে

লাগলেন। ফলে তার মুনাফা হলো প্রচুর। একবার ১২০০ মণ নীল থেকে তার মুনাফা হয় ১৯৮,০০০ টাকা। স্বভাবতই মুনাফার কথা জেনে অন্যান্য ইউরোপীয়রা এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়। নীল-কুঠি স্থাপনের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিশেষভাবে সহায়তা করে। ইউরোপীয় নীলকরদের কোম্পানী অগ্রিম টাকা দিয়ে সাহায্য করে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিন্সেপ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত কনট্রাক্টরদের সঙ্গে কোম্পানীর নির্ধারিত মূল্যে নীল সরবরাহের জন্য চুক্তি হয়, তাঁরা হলেন ডগলাস, উডনি, ফারগাসন, বারেতো, জে. পি. স্কট ও হেনরী স্কট। ফলে বাংলায় কয়েকটা নতুন নীলকুঠি নির্মিত হয়। যেহেতু তখনই বাংলার কৃষকদের এই নতুন চাষে আকৃষ্ট করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল এবং বাংলায় উৎপন্ন নীলের পরিমাণও বেশী হয়নি, তাই সেই সময় এসব ইউরোপীয় কনট্রাক্টরেরা দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি জায়গা থেকেও নীল সংগ্রহ করতেন। এইভাবেই কোম্পানীর সঙ্গে তাঁদের চুক্তির শর্ত পালন করতেন। ইতিমধ্যে বাংলায় নীলকুঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শীঘ্র রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে নীলের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। এ সম্পর্কে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের উক্তি বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। তিনি এ দ্রব্যকে নতুন সম্পদ আহরণের উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু কোম্পানীর এই প্রথম দিকের প্রচেষ্টা সন্তোষ জনক হয়নি। ইংলণ্ডে নীলের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ায় এবং ইউরোপের বাজারে নীলের চাহিদা খুব বেশী ওঠা নামা করায় নীল রপ্তানি অ-লাভজনক হয়ে ওঠে। তাছাড়া কোম্পানীর লোকসানও হয় অনেক। আশী হাজার পাউণ্ড কোম্পানীর লোকসান হয়। কয়েক বছরে নীল শিল্পের উন্নতির জন্য কোম্পানী দশ লক্ষ স্টার্লিং মুদ্রা নীলকরদের অগ্রিম সাহায্য করে। এই লোকসানের ফলে কোর্ট অব ডিরেক্টর অনুসন্ধান চালায়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চের

চিঠিতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ তিন বছরের জন্য নীলে আর কোন টাকা নিয়োগ করতে নিষেধ করে এবং কোম্পানী নীল ক্রয় করা বন্ধ করে দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নীলের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। কোম্পানী কর ও মালের ভাড়াও কমিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য হলো এই যে এর ফলে নীলের ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। এইভাবে উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে এবং নীল প্রস্তুত করবার খরচও কম পড়বে। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ইংলণ্ডে নীল রপ্তানি করার মধ্য দিয়ে ভারতে সংগৃহীত অর্থ প্রেরণের এটাই হবে সুবিধাজনক ও আইনসম্মত উপায়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু অভিজ্ঞ নীলকরেরা এবং দাস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা মুনাফার সন্ধানে বাংলাদেশে আসে। তারা সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নীল চাষ সুরু করে এবং নীলকুঠি স্থাপন করে। এ ব্যবসাতে বহু সংখ্যক কোম্পানীর কর্মচারী ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাও অংশগ্রহণ করে। যেহেতু এখানে জমি নীলচাষের পক্ষে উপযোগী ছিল এবং শ্রমের মূল্য স্বল্প ছিল, সেজন্য নীলচাষের অনেক সুবিধা হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় আমেরিকান ও ফরাসী দেশীয় নীলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের নীল প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে সেন্ট ডোমিঙ্গোতেও নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলার নীলের ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে নীল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বহুল পরিমাণে ভারতীয় নীল ইংলণ্ডে রপ্তানী হতো। ব্যবসায়ীদের কাছে নীল প্রধান রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে নীল আমদানীর পরিমাণ ছিল ২,৯৫৫.৮৬২ পাউণ্ড। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে

৪০,০০০ মণ নীল কলকাতা থেকে ইংলণ্ডে আমদানী হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে নীলের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই রপ্তানি বাণিজ্যে ওঠানামাও ছিল। বৃটিশ কোম্পানী কোন সময়ে নীলচাষ ও প্রস্তুত করার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও, অগ্রিম অর্থ ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে নীলচাষের সম্প্রসারণের বন্দোবস্ত করেছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী বিভিন্ন নীলকরদের অর্থ অগ্রিম দেয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কোম্পানী এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নীলচাষের গোড়াপত্তন কোম্পানীর আর্থিক ও নানাবিধ সাহায্যের ফলে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এরপর কয়েক বছর কোম্পানী নগদ টাকা দিয়ে বাজার থেকে নীল ক্রয় করে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নীলের বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কোম্পানী অর্থ অগ্রিম দেওয়া বন্ধ করে দিলে পর ইউরোপীয় নীলকরেরা টাকার জন্য কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্পে এজেন্সি হাউসেস্ বা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এজেন্সি হাউসেস-এর সংখ্যা ছিল ১৫টি। বেশীর ভাগ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ছিল বৃটিশ। এদের মধ্যে মেসার্স ফারগাগন; ফেয়ার্লি এণ্ড কোং; প্যাকসটন, ককরেল এণ্ড ডেলিসলি; ল্যাম্বার্ট এণ্ড রস; কলভিনস এণ্ড ব্যাজেট; এবং যোশেফ রাবেট্টো প্রসিদ্ধ ছিল। কলকাতাতে তিনটি ব্যাঙ্ক ও চারটি বীমা কোম্পানী ছিল এদের পরিচালনাধীন। নীল ও চিনি শিল্পের প্রধান পুঁজি সরবরাহক ছিল এই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও এদের নিয়ন্ত্রণাধীণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নীলকরেরা তাদের সম্পত্তি ইত্যাদি বন্ধক রেখে এদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-গুলোর সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। বাণিজ্যে মন্দা ও

অর্থনৈতিক সংকটের সময় গবর্ণমেণ্ট এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। অন্যদিকে এজেন্সি হাউসেস গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধকার্যের বাবদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য দেয়। ভারতে বৃটিশ শাসনের সম্প্রসারণের যুগে গবর্ণমেণ্টের সাথে এজেন্সি হাউসেস-এর সম্পর্ক নানাভাবে গড়ে ওঠে। কোম্পানীর কর্মচারীরা এজেন্সি হাউসগুলোতে অর্থ লগ্নী করে। আবার এই হাউসগুলো নীলকরদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। অন্যদিকে নীলকরেরা কৃষকদের দাদন দিয়ে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। নীলচাষে পুঁজি লগ্নীর এই নতুন পিরামিডের ভিত করা হলো বাংলার কৃষক সমাজকে। আর পুঁজি লগ্নীকারী ও নীলকরদের যে কোন অসুবিধার জন্য কৃষক সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করবার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হলো। এই কারণেই লর্ড বেণ্টিঙ্ক নীলচাষীদের চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে "প্রতারণা, চাতুরি ও ষড়যন্ত্র" ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সি হাউসেস-এর সংখ্যা হয় ২৯টি। এই সময়ে কোম্পানীর শুল্কনীতিও চালু হয়। ফলে বাংলার বাণিজ্যে ও শিল্পে দেশীয় বণিকেরা হঠতে থাকে। এইভাবেই কৃষি অর্থনীতিতে বৃটিশ ক্যাপিটালিস্ট জমিদারদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়, যেমন, সিল্ক, নীল, পাট, চিনি তূলা, চা, কফি, ও রবার ইত্যাদিতে।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় নীলকরদের মধ্যে বৃটিশদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কিছু সংখ্যক ফরাসী ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নীলকরেরাও এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম দিকে কোম্পানী বেশী সংখ্যক ইউরোপীয়কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসের অনুমতি দেয়নি। নীলকরদের নীলকুঠি ইত্যাদি স্থাপনের প্রয়োজনে জমি সংগ্রহের জন্য কোম্পানীর অনুমতি নিতে হতো। সাধারণত কোন কুঠিকেই ৫০ থেকে ৭৫ বিঘার বেশী জমি নিতে দেওয়া হতো না। নীলকরেরা নীলচাষের পক্ষে এই স্বল্প পরিমাণ জমিতে মোটেই খুশি হয়নি। তাই আইনকে ফাঁকি দিয়ে তারা বেনামীতে বা কুঠির দেশীয় কর্ম-

চাষীদের নামে জমি রাখতে আরম্ভ করে। নীলকরেরা কুঠির সন্নিকটস্থ কৃষকদের নীল বুনতে প্রলুব্ধ করে, দাদন দেয় এবং নির্ধারিত মূল্যে নীলকুঠির কাছে বিক্রী করার ব্যবস্থা করে কৃষকেরা চাষ করতে রাজী না হলে লাঠিয়াল ইত্যাদির সাহায্যে বলপ্রয়োগ করা হতো। যেহেতু নীলচাষ করার ফলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং নীলচাষ মোটেই লাভজনক ছিল না, সেজন্য অনেক সময় কৃষকেরা জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে পারতো না। ফলে জমিদারেরা কখনও কখনও কৃষকদের নীলচাষে বারণ করতো। অনেক সময়ে এই কারণেই ইউরোপীয় নীলকর ও জমিদারদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। তাছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় নীলকরদের মধ্যেও তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে সংঘর্ষ দেখা দেয়। শীঘ্র নীলকরগণ আপোষে নিজেদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের বন্দোবস্ত করে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলকর সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নীলকরেরা আরও বেশী সংঘবদ্ধ হয় এবং প্রজাকুলের দুরবস্থাও বৃদ্ধি পায়।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলা নীলকুঠিতে পূর্ণ হয়ে যায়। বেশী লাভজনক হয় বলে নীলকরেরা মিলিতভাবে বড় বড় যৌথ কোম্পানী স্থাপন পূর্বক এক একটি বিস্তৃত কনসার্ন বা কারবার খুলে বসে। নানাস্থানে অনেকগুলো করে কুঠি এক একটি কনসার্নের অধীন থাকতো। সবগুলো একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন ছিল। আবার কেউ কেউ নিজে স্বত্বাধিকারী থেকে বড় কনসার্ন বা কারবার খুলতেন। এমনি করে নীলের কারবারে একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের আবির্ভাব হয়। অর্থবান দেশীয় জমিদারেরাও ইওরোপীয় নীলকরদের অনুকরণে নীলকুঠি স্থাপন করে। যেমন দ্বারকনাথ ঠাকুরের, নড়াইলের জমিদারগণের, যশোহর সদর মহকুমায় নলডাঙ্গা রাজগণের এবং আরো অনেকের নীলকুঠি ছিল। কোথাও কোথাও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দেশীয় জমিদারেরা ইউরোপীয়দের নিয়োগ করে কিন্তু শেষ

পর্যন্ত দেশীয় জমিদার-নীলকরেরা ইউরোপীয় নীলকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বণ্ড প্রথমে যশোহরে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নীলকুঠি নির্মাণ করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যশোহর জেলা নীলকুঠিতে পূর্ণ হয়। নদীয়া-যশোহরের নীল উৎকৃষ্ট নীল হিসাবে পরিগণিত হয়। বড় বড় নীলের কারবারের জন্য বনগ্রাম, মাগুরা ও ঝিণাইদহ এই তিনটি মহকুমা বিখ্যাত ছিল। নদীয়া যশোহরে বেঙ্গল-ইণ্ডিগো কোম্পানীর কারবারই ছিল সবচেয়ে বড়। বেঙ্গল-ইণ্ডিগো কোম্পানীর অধীনে চারটি কনসার্ন ছিল। এর অধীনস্থ কাঠগড়া কনসার্নেই প্রথম নীল বিদ্রোহ সুরু হয়। এসব কনসার্নের অধীনে হাজার হাজার বিঘা জমিতে নীলের চাষ হতো। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ জন চীপ (ইনি সোনামুখির প্রথম কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ছিলেন) বীরভূমে নীল প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে নীল প্রস্তুত করার বিষয়ে বীরভূম জেলা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইলামবাজার ও সুপুর ছিল নীলের প্রধান কেন্দ্র। এখানে বেশ বড় বড় নীলকুঠি ছিল। মিঃ ডেভিড এরস্কিন নামক জনৈক ব্যবসায়ী ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলাতে আসেন। পরে তিনিও ডোরাণ্ডা ও ইলামবাজার নামক জায়গাতে নীলকুঠি নির্মাণ করেন। তিনি এরস্কিন এণ্ড কোম্পানী স্থাপন করেন এবং কয়েকটি কয়লা খনির মালিক ছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের বীরভূমের কালেক্টরের চিঠিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ে মিঃ রোবার্ট হেভেন নামক একব্যক্তি বিষ্ণুপুরে নীলচাষের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। মেদিনীপুর জেলাতে মেসার্স ওয়াটসন এণ্ড কোম্পানীর পরিচালনায় নীলের চাষ সুরু হয়। তাছাড়া এ জেলাতে নীল প্রস্তুত করা প্রধান শিল্প হিসাবে গণ্য হতো। প্রায় একশত বছর ধরে এ কোম্পানী মেদিনীপুর জেলাতে নীল ও সিল্ক প্রস্তুত করে। আর অনেকগুলো কুঠিও স্থাপন করে। বর্দ্ধমান জেলার কালনা বুদবুদ এবং থানা

ইত্যাদি অঞ্চলে নীল উৎপন্ন হতো। বর্দ্ধমানের অনেক নীলকুঠি এ দেশীয় ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন ছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ে বর্দ্ধমানে বসবাসকারী মঁসিয়ে বানিয়ন নামক ব্যক্তিকে নীল তৈরী করতে অনুমতি দেওয়া হয়। রাজশাহী জেলাতেও প্রচুর নীল উৎপন্ন হতো। এ শিল্পে মেসার্স ওয়াটসন এণ্ড কোম্পানীর কর্তৃত্ব ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে দুটো নীলকুঠি ছিল। ক্রমান্বয়ে নীলকুঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩টি কুঠিতে নীল প্রস্তুত হতো। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় নীলকরেরা রংপুর জেলাতে নীলের চাষ সুরু করে। কিশোরগঞ্জে প্রকাণ্ড এক নীলকুঠি তৈরী করে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় নীলকরেরা নীল প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এখানে গোয়ামালতির নীলকুঠি বিশেষ বিখ্যাত ছিল। শীঘ্র নীলকুঠির সংখ্যা হয় কুড়িটি। তাছাড়া ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ফরিদপুর বগুড়া, খুলনা, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় অনেক নীলকুঠি নির্ম্মিত হয়। বারাসাত, রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন জায়গায় বহু নীলকুঠি তৈরী হয়। বারাসাতের কাছে বারাসাত-ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে নীলগঞ্জ নামক গ্রামের নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এ কুঠি নির্মিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিঃ প্রিন্সেপ। তাছাড়া তিরহুত, পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, বেনারস, এলাহাবাদ এবং মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গাতেও ইউরোপীয় নীলকরদের প্রচেষ্টায় নীলের চাষ ও উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে নীলকুঠির সংখ্যা হয় প্রায় এক হাজার।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নীলকুঠির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীলকরেরা বৃটিশ শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করবার জন্য খুবই তৎপর হয়। অর্থনৈতিক উৎপাড়নের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের সমতল-

ভূমির এবং অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্রোহকে দমন করতে নীলকরেরা গভর্ণমেন্টকে নানাভাবে সাহায্য করে। ওয়াহাবি ও ফরাজী আন্দোলন দমনে নীলকরেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মোল্লাহাটি নীলকুঠির নীলকর মিঃ ডেভিস্ লোকজন সংগ্রহ করে তিতুমীরের দলকে আক্রমণ করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বৃটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে। তাদের কাছে নীলকুঠিগুলো ছিল অত্যাচারের প্রতীক। বিদ্রোহীরা নীলকরদের কুঠি ছেড়ে চলে যাবার জন্য নোটিশ দেয়। সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য নীলকরেরা বিভিন্নভাবে সরকারের সাথে সহযোগিত করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যাতে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য নীলকরেরা বিভিন্ন জেলাতে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যুক্তভাবে বাহিনী গড়ে তোলে এবং প্রস্তুত হয়ে থাকে। নীলকরদের এ তৎপরতা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

প্রথম থেকেই গ্রামাঞ্চলে অবাধে জমি খরিদ করবার দাবী নীলকরেরা পেশ করতে থাকে। নীলকররা জমিদারীর কর্তৃত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে কারণ জমিতে অধিকার অর্জন না করলে নীলে নিযুক্ত পুঁজির নিরাপত্তা বিধান করা ও কৃষকদের জোর করে নীলচাষে বাধ্য করার অনেক অসুবিধা ছিল। যদিও গভর্ণমেণ্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ রেগুলেশন এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম রেগুলেশন নামক ছুটো আইনে নীলকরদের সুবিধা করে দেয়। কৃষকেরা নীলকরদের সাথে চাষের বিষয়ে চুক্তি করবার পর যাতে সেই চুক্তির শর্তাদি অগ্রাহ্য করতে না পারে এবং নীলকরদের প্রতারিত করতে না পারে, এ ছুটো আইনে তার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম রেগুলেশনে চুক্তিলঙ্ঘনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়। এই আইন অনুসারে

চুক্তিভঙ্গকারী নীলচাষীরা ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। আর কৃষকদের দুরবস্থাও দেখা দেয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম আইন এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম আইন যা 'হুফতুম্' ও 'পঞ্চম' আইন নামে খ্যাত, তা ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণমেণ্ট নীলকরদের নিজের নামে জমি ইজারা নেবার অধিকার দেয়। দেশীয় জমিদারেরাও সেলামী ও বেশী খাজনার লোভে নীলকরদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করতে থাকে। নীলকরেরা পত্তনী, দর-পত্তনী, মৌরসী, দর-মৌরসী, ইজারা প্রভৃতি বন্দোবস্ত দ্বারা জমি ও প্রজার মনিব হয়ে বসে। এমনিভাবে নীলকরেরা জমিদারী অর্জন করার পর, তারা জমিদার ও নীলকর হিসাবে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

বাংলাদেশে নীলের চাষে প্রধানতঃ দুটো পদ্ধতি ছিল, যথা, 'নিজাবাদ' এবং 'রায়তি'। নীলকরদের নিজস্ব জমিকে 'নিজাবাদ' বলা হয়। এই জমিতে নীলকরেরা নিজের খরচে, নিজের লোকজন দিয়ে, নীলচাষ করে। প্রয়োজনমত মজুরীর বিনিময়ে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করা হতো। প্রতি কুঠিতে বহু সংখ্যক ভূমিহীন দিনমজুর (এরা কুলি নামে পরিচিত) কাজ করতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল সিংভূম-মানভূম অঞ্চলের আরণ্যক উপজাতি গোষ্ঠীর এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ভূমিহীন দিনমজুর। নীলকুঠিতে নিযুক্ত 'ভুনা' উপজাতির মজুরদের বলা হতো 'ভুনা কুলি'। এদের মজুরি ছিল খুবই অল্প। আর কৃষকদের যে জমি সম্পর্কে নীলকরদের সঙ্গে চুক্তি হয় তাকে 'রায়তি' বলে। নীলকরেরা এ জমির জন্য কৃষকদের বিঘাপ্রতি দুটাকা দাদন দিত। বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এ 'রায়তি' প্রথাই প্রচলিত ছিল। এ প্রথা নীলকরদের কাছে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। কারণ চাষ আবাদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হতো কৃষককেই। এ দুটো প্রথা ছাড়া 'শুকদাদন' নামক

নীলচাষের আর একটা প্রথা দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া ও শাহাবাদ জেলাতে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুসারে কৃষকেরা নীলবৃক্ষ উৎপন্ন করার পর নীলকরদের কাছ থেকে এক টাকা করে পেত।

প্রথম থেকেই নীলকরেরা কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে উল্লেখ করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট এ দেশীয়দের ওপর অত্যাচারের অভিযোগে চারজন নীলকরের অনুমতিপত্র প্রত্যাহার করে। এই সময়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ প্রবল ছিল, যথা, আঘাতের ফলে দেশীয়দের জীবননাশ, কুঠিতে কয়েদ রাখা, এদেশীয়গণকে প্রহার করা এবং অন্যকুঠির সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। নীলের চাষে কোনই লাভ না থাকায়, ধান ফসলের জমির চাষ আবাদে ক্ষতি করে, কৃষকেরা নীলের চাষ-আবাদে অসম্মত হয়। তাছাড়া একবার দাদন গ্রহণ করলে বংশ পরম্পরায় নীলকরদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। নীলকর ও কুঠির কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে থানা বা বিচারালয়ে সুবিচার পাওয়াও কষ্টকর ছিল। যেহেতু একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, তেমনি নীলকরদের সাথে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ দারোগার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ফলে নীলচাষকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

নীলচাষ সম্পর্কে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন যে, এদেশে নীলচাষ ও ইউরোপীয়দের বসবাসের ফলে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই প্রচুর উপকার হয়েছে। যেখানে নীলচাষ ও নীলকুঠি নেই সে সব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে নীলকুঠির আশেপাশের অধিবাসীদের অবস্থা অনেক ভাল। তাঁরা মনে করতেন যে, ইউরোপীয় মূলধন ও নৈপুণ্য ব্যবহার হলে এদেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতি ঘটবে। তাই তাঁরা উভয়েই এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের পক্ষপাতী

ছিলেন। এ কারণেই ইউরোপীয় চরিত্রের ভালদিকটির ওপর জোর দেওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এজন্য নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ তাঁদের মন্তব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। নীলকরদের আচরণ সম্পর্কে তাঁদের ভাল ধারণা থাকলেও, কোথাও কোথাও যে অত্যাচারী নীলকর ছিল, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। তবে সম-সাময়িক তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে অত্যাচারী নীলকরদের সংখ্যা মোটেই সামান্য ছিল না। বরঞ্চ উৎপীড়ন নিপীড়নকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশে নীলচাষের সমৃদ্ধি ঘটে। নীলকর ও কুঠির কর্মচারীদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাদের সম্পর্কে কোন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে কিনা এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের মতামত জানবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে দুটো সার্কুলার প্রেরণ করে। বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্টে নীলকরদের অত্যাচারের অনেক তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাহলেও গভর্ণমেণ্ট নীলকরদের অত্যাচার দমন করে কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব করবার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তৎপর হয়নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শিল্প-পুঁজির (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল) প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবার ফলে ভারতে কোম্পানীর এক-চেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরালো হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার শেষ হয় এবং ভারতের অর্থনীতিতে শিল্পপুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই শিল্পপুঁজির জন্য বাংলার এজেন্সি হাউসেসগুলো কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এজেন্সি হাউসেসগুলোর পতন ঘটে। বৃটিশ পুঁজি-পতিদের ব্যবস্থাপনায় ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার আবির্ভাব ঘটে। এভাবেই বৃটিশ পুঁজিপতিরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে

ইউরোপীয়রা এদেশে জমিজমা কিনে দখল করার এবং লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর অধিকার অর্জন করে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও 'নীলকর সঙ্ঘ' ইউরোপীয়দের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার্থে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। শিল্প-পুঁজির আমলে শোষণের নিখুঁত পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার ফলে বাংলার দুঃখ বেদনাই পরবর্তীকালে ব্যাপক বিক্ষোভের রূপ নিয়ে নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

[নীল বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি রচনা করেছি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় দুটো সংখ্যায় এই শিরোনামায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়—'নীলচাষের গোড়ার কথা' (২২ মে, ১৯৬০) এবং 'নীলচাষের দ্বিতীয় অধ্যায়' (২৯ মে, ১৯৬০)। এখানে শিরোনামা পরিবর্তন করে প্রকাশ করা হল।]

বাংলায় নীলচাষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য ও উৎসাহে বাংলাদেশে নীলের চাষ সুরু হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় নীলের চাষ বিস্তৃত হয় এবং বহু নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে। আর নীলের চাষকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা দেখা দেয়। উৎপীড়ন-নিপীড়নকে ভিত্তি করেই এখানে নীল চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। নীলের চাষ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে, বিশেষ করে নীল চাষীদের দুরবস্থা নিয়ে, ঊনিশ-শতকের বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব ব্যক্ত হয়। এদিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতামত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

স্বভাব কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রভাকর প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন প্রভাকর দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হত। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক হন। ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবার প্রভাকর' পত্রিকায় বহুবার বাংলার চাষীদের দুঃখদুর্দশার কথা আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করছেন যে, বাংলার চাষীদের দুঃখ-বেদনা বেড়েই চলেছে, আর দেশের আর্থিক ক্রমাবনতিও ঘটেছে। তিনি কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ দুটো কারণ উল্লেখ করেছেন, যথা প্রথমতঃ বৃটিশ

শাসকদের জনস্বার্থবিরোধী আইনকানুন ও শোষণনীতি এবং দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার গ্রাম্য জীবনে পত্তনিদার, ইজারাদার ইত্যাদিদের কেন্দ্র করে নতুন শোষকশ্রেণী মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এই বিশ্লেষণ খুবই যথার্থ। এ প্রসঙ্গে জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে ইশ্বরচন্দ্রের বক্তব্য আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেক সময়েই 'সংবাদ প্রভাকরে' জমীদারদের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে নতুন ধরণের জমিদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন ও জমিদারদের আবির্ভাব বিষয়ে প্রভাকর সম্পূর্ণ সচেতন থাকলেও জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে যে একটা শ্রেণীগত পার্থক্য রয়েছে তা পরিষ্কার করে বুঝতে পারেননি।

সেজন্য কৃষকদের দুর্দশার জন্য তিনি জমিদারদের ততটা দায়ী করেননি। বরঞ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন নিলাম আইন ইত্যাদির ফলে জমিদারদের অবস্থাও যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার কথা বলেছেন (সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে ভাদ্র, ১২ জুন এবং ২০ আগষ্ট, ১৮৫৭)। তাহলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রজাদের দুর্দশা দূরীকরণে জমিদারদের অবহেলাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের জন্য যে গভীর বেদনা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, তার ফলে তিনি নীলচাষীদের দুরবস্থা দূর করবার অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আলোচনা, সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি খুবই প্রণিধানযোগ্য। সংবাদ প্রভাকরে তিনি এ সমস্যার উপরে আলোচনা করেছেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার জনমত গঠনে ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২রা আষাঢ়, ১২৫৫, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে, নীলকর সাহেবরা কৃষকদের ওপরে অত্যাচার করছে, অথচ ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে আবেদন করেও কোন সুবিচার পাওয়া যায় না। নীলকরদের সাথে ম্যাজিষ্ট্রেটদের খুবই খাতির রয়েছে।

তাছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেটরা নতুন আইনের বলে ১৫ দিন জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা পর্যন্ত করতে পারত। তার বিরুদ্ধে আপীল করা যেত না। ঈশ্বর গুপ্ত এই আইনের প্রতিবাদ করেছেন।

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্ন জলা থেকে যে সমস্ত পত্র প্রেরকরা সংবাদ পাঠাত তাও প্রভাকরে প্রকাশিত হত। যশোহরস্থ কোন পত্রপ্রেরক লেখেন যে, নসীবসাহী পরগণার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে প্রজামণ্ডলীর খুবই দুরবস্থা হয়েছে। এমনকি সদ্বংশজাত ভদ্রলোকদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। নীলকরেরা জোর করে তাঁদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং নীল বুনতে বাধ্য করছে। যাঁরা অর্থবান তাঁরা নীলকুঠির আমলাদের ২০০।৪০০ টাকা ঘুষ দিয়ে রক্ষা পাচ্ছেন। যাঁরা দরিদ্র তাঁদের আর কোন উপায় নেই (সংবাদ প্রভাকর, ১১ই চৈত্র ১২৫৮, ইং ২৩শে মার্চ ১৮৫২)। এ সম্পর্কে ৩রা শ্রাবণ ১২৫৯ (ইং ১৭ই জুলাই, ১৮৫৮), সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে আলোচনা করা হয়, তা হচ্ছে এইরূপ—"আমরা জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি নসীবসাহি পরগণার বর্তমান দুরবস্থার বিষয়ে অনেক পত্র প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যদ্রূপ ক্লেশ বর্ণিত হইয়াছে, ···। নীলকর সাহেবদের ইজারার মেয়াদ অতীত হইয়াছে, তথাপি গত চৈত্র মাসাবধি তাহা তাঁহাদের স্বাধিকারে রাখিয়া অত্যাচার পূর্বক কর আদায় করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, জমীদার মহাশয়েরা দেখিয়া শুনিয়াও ইহার কোন উপায় নির্ধারণ চেষ্টা করিতেছেন না···। বাস্তবিক প্রজাবর্গ প্রতি জমিদারের অবহেলা নিবন্ধন অতীব অত্যাচার হইতেছে,···।" এমনিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রজাদের দুরবস্থা লাঘবের ব্যাপারে জমিদারদের অবহেলা দেখে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ২৩শে ফাল্গুন, ১২৫৮ ; ৪ঠা কার্তিক ১২৬১ ও ১লা মাঘ, ১২৬৫ ইত্যাদি সংবাদ প্রভাকরের সংখ্যায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কেবলমাত্র বিভিন্ন অঞ্চলের পত্রপ্রেরকদের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন

না। তিনি নিজে অনেকস্থান ভ্রমণ করে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ঘটিত সংবাদ সংগ্রহ করেন। অবশ্য নীলকর সাহেবদের মধ্যে যাঁরা প্রজার সুখ-সুবিধার বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তিনি তাঁদের প্রশংসা করতে কার্পণ্য বোধ করেননি। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে কয়েকটি গান রচনা করে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সে গান বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন (সংবাদ প্রভাকর, ইং ৩রা মার্চ, ১৮৬০)।

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত গান থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। নীলচাষের ফলে প্রজার যে কি দুরবস্থা হয় তারই কথা তিনি গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

"কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা ;
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে,
এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে
কেবল বর্ষে যাতনা
'আসিয়া' আসিয়া মাগো করুণাময়ী
করুণা চক্ষে দেখ না।
নামেতে নীলের কুঠি, হতেছে কুটি কুটি
দুখী লোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়
কুঠেল সব সাহেবজাদা, ধপ্ ধপে বাইরে সাদা
ভিতরে পচা কাদার ভড় ভড়ানি
পেঁকো গন্ধ তায়।"

নীলকর সাহেবদের মধ্য থেকে অনররি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলে

নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে গুপ্ত কবি নিম্নোক্ত গান রচনা করেন :—

"হ'লো নীলকরদের অনরারি
মেজেষ্টরি ভার।
কুইন মা, মা, মা মাগো
পড়েছে সব পাত্তরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর।
নীলকরদের হদ্দ নীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হল কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হল ডাইনের কোলে ছেলে সপাঁ
চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে
শুনেনি কেউ শুনবে না।"

নীলের দাদন গ্রহণ করার ফলে চাষীরা যে সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন :—

"জমি চুন্‌চে, দিন গুনচে, কেবল বুন্‌চে বীজ,
দোহাই না শুন্‌চে একটি বার।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার।
* * *
তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল কাঙলা,
সয় না অত্যাচার।"

নীলকরদের উপরে রচিত বিভিন্ন গানের কোন কোন অংশে

রাজভক্তির পরিচয় থাকলেও গুপ্তকবি যথেষ্ট দরদ দিয়ে নীলচাষীদের দুঃখ-বেদনার চিত্র এঁকেছেন।

এবার সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কি মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তা দেখা যাক। সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য নীলকরেরা সরকারের সাথে সহযোগিতা করে। এই বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কাছে নীলকুঠিগুলো ছিল অত্যাচারের প্রতীক। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহীরা নীলকরদের কুঠি ছেড়ে চলে যাবার জন্য নোটিশ দেয়। সাঁওতাল দলের একজন অধ্যক্ষ শিবসহায় ভকত সংগ্রামপুরের নীলকুঠির অধিকারী গ্রান্ট সাহেবকে যে দুটো আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন তার বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ২৬ মাঘ, ১২৬২ (ইং ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬), সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আজ্ঞাপত্র দুটি উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে আমরা নিম্নে দুটো আজ্ঞাপত্রই সংবাদ প্রভাকর থেকে তুলে দিলাম।

শিবসহায় ভকতের প্রথম আজ্ঞাপত্র : "অনুমতি করিতেছি যে এই আজ্ঞাপত্র প্রাপ্তানন্তর তুমি দ্রব্যাদি লইয়া কুঠি ছাড়িয়া প্রস্থান করিবে, ইহাতে যদ্যপি সম্মত না হও অথচ কোন আপত্তি কর তবে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবেক না। এই আজ্ঞাপত্র দ্বারা তোমাকে জানাইতেছি যে, আমাদিগের সেনারা বুধবার দিবসে তোমার কুঠি অধিকার করিবেক, তাহারা প্রজাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিবেক না, বরং বাহুবলে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেক। ৩০ পৌষ ১২৬২।"

এই রাজ্যের নতুন রাজা শিবসহায় ভকতের দ্বিতীয় আজ্ঞাপত্র : "রামজুঙ্গল এই দেশ জয় করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে জানাইতেছি যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা তাহা তুমি আমাকে জানাইবা, তাঁহারা যদ্যাপি

আমারদিগের সুবা আক্রমণ করেন তবে রাইয়ৎদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, আর ইংরাজ সেনারা যদ্যপি আগমন করে তবে তাহাতেও রাইয়ৎদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক. অতএব ইহা কর্তব্য হয় যে, কেবল কিশোরী সুবা ও ইংরাজেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবেক, তাহা হইলে রাইয়ৎদিগকে কোন প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক না, অতএব এই পত্রের স্পষ্টানুমতি প্রেরণ করিবে, আর এই অনুমতি যাহারদিগের উদ্দেশে প্রেরণ করা গেল ডাক যোগে তাহাদিগকে ইহার স্থূল বিবরণ জ্ঞাত করিবে। এই পত্র সিরিস্তাদারের নিকট প্রেরণ করা গেল। ২৯শে পৌষ, ১২৬২। পূর্ণিমা সোমবার।"

সংগ্রামপুরের নীলকর সাহেব এই দুটো পত্র অনুবাদ করে কলকাতায় নীলকরদের সভায় প্রেরণ করেন। এই দুটো পত্র নিয়ে নীলকর সভা বিস্তারিত আলোচনা করে এবং ঐ সভার সম্পাদক ডবলিউ থিওবোলড্ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সিসিল বিডন সাহেবের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে সাঁওতালরা যে পুনর্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কাছে শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করা হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাঁওতাল বিদ্রোহীদের 'দুরাত্মা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে না পারার জন্য বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরকে সমালোচনা করেছেন। আর দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, এর ফলে প্রজারা পুনর্বার গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। গুপ্তকবির বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই বিদ্রোহের তাৎপর্য তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও বাংলাদেশের নীলকরদের বিশেষ তৎপরতা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যাতে এই বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য নীলকরেরা বিভিন্ন জেলাতে সরকারী

কর্মচারীদের সঙ্গে বাহিনী গড়ে তোলে এবং প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে ধরা পড়েনি। তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্রোহীদের সমালোচনা করেছেন এবং এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন (সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৬-১৭ আষাঢ়, ১২৬৫)। তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে, সমসাময়িক অন্যান্য অনেকের মত, গুপ্তকবির লেখনীতে বিদ্রোহের তাৎপর্য বিশ্লেষণে যে স্বচ্ছতার অভাব দেখতে পাওয়া যায় তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ইংরেজদের শাসন ও শোষণের নির্মম সমালোচনার পাশাপাশি রাজভক্তির প্রকাশ তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের বিরোধ অর্থাৎ আদর্শ প্রচার ও আচারের মধ্যে সঙ্গতির অভাব, সে সময়ে অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই ছিল। তাহলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেভাবে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে, সমাজ কল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে লেখনী চালনা করেছিলেন, সেই সব রচনা পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর দেশবাৎসল্যের পরিচয় অপ্রকাশিত থেকে যায়। অথচ প্রথম-যুগে বাংলাদেশে স্বদেশ প্রীতির কথা যাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে তিনি একজন ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উল্লেখ যোগ্য : "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলদেশে দেশ বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্যতাহাদিগের কিঞ্চিৎ পূর্বগামী! ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।"

['যুগান্তর সাময়িকী', রবিবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৬৭ ; ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬০]

আদিবাসী সমস্যা প্রসঙ্গে

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব বিরোধ-সংঘর্ষ চলছে, যার ফলে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হচ্ছে, তাকে এই কয়েকটি ভাগে নির্দিষ্ট করা যায়ঃ (১) হিন্দু-মুসলিম বিরোধ; (২) সর্বভারতীয় সত্তার সঙ্গে আঞ্চলিক সত্তার বিরোধ; (৩) উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুর বিরোধ; (৪) আদিবাসীর সঙ্গে অ-আদিবাসীদের বিরোধ; (৫) গ্রামীণ সত্তার সঙ্গে শহুরে সত্তার বিরোধ। এর মধ্যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরোধকে, বিশেষ করে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী বিরোধকে, এবং বৃহৎ সংস্কৃতির সঙ্গে ক্ষুদ্র সংস্কৃতির বিরোধ বলে উল্লেখ করা হয়। দেশ-ভাগের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক সমস্যার জটিলতার প্রধান কারণই ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধান করতে না পারায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। তখন যাঁরা এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, দেশ ভাগ হলে হিন্দু মুসলমান সমস্যা আমাদের বিব্রত করবে না, তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। আজও ভারতের জাতীয় জীবনে এই সমস্যা জটিলতার সৃষ্টি করছে। তার সঙ্গে আদিবাসী সমস্যা ও আরও কয়েকটি সমস্যা যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ জাতীয় সংহতির ভিতকে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল করে ফেলেছে। একটি প্রবন্ধে এই সব সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানে আমি আদিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করব। স্বভাবতই এই প্রবন্ধকে আদিবাসী সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মনে করা উচিত হবে না।

সংস্কৃতি ও ভাষা অনুযায়ী আদিবাসীদের ত্রিশটি বা তার কিছু

কম গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। তাঁদের আমরা 'জাতি' বলব কি 'অনুজাতি' বলব এই নিয়ে গবেষক মহলে আরও আলোচনার প্রয়োজন হলেও, তাঁদের যে একটি পৃথক সত্তা রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীনকালে আর্যদের আগমনের পরে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সংঘাতের ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নবরূপ ধারণ করলেও আদিবাসী সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রটি ব্যাপ্ত হয়ে সমন্বয়ের ধারাকে সুদৃঢ় করলেও, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারাটিও অব্যাহত থাকে। আর্যীকরণের প্রভাব সব আদিবাসীদের মধ্যে একই রকম হয়নি; কোথাও একটু বেশী, আবার কোথাও হয়তো একটু কম। পরবর্তীকালে ইসলাম, হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও, আদিবাসীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম আদিবাসী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানের আদি-বাসীদের বাদ দিলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী জনসমষ্টি বৃহত্তর হিন্দু পরিমণ্ডলের মধ্যেই অবস্থান করছে। তাঁদের হিন্দু বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসও কোন কোন হিন্দু সংগঠনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী জনসমষ্টি বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করেন, যথা—অ্যানিমিজম (animism), হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আদিবাসী সমাজে তার প্রভাবও পড়ে। ধর্মীয়-সামাজিক জীবনে, আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্যও দেখা দেয়। তা আদিবাসী সমাজকে আলোড়িত করে এবং সংঘাতের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে animism-এর প্রভাবই বেশী, তারপরে হিন্দু ধর্মের। আদিবাসী হিন্দুদের তুলনায় খ্রীষ্টানদের সংখ্যা অনেক কম; বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সংখ্যা অনুপাতে

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের এইভাবে উল্লেখ করা যায়ঃ (ক) অ্যানিমিসট্স (Animists), (খ) হিন্দু, (গ) খ্রীষ্টান, (ঘ) বৌদ্ধ। সুতরাং আদিবাসী সমস্যা আলোচনায় তাঁদের ধর্মীয় অবস্থান এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজের গড়নটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার ফলে আমরা ভারতীয় জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলনের ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রটিও বুঝতে পারবো।

আদিবাসী অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রয়াসের ফলে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রচেষ্টায় আদিবাসী সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্য দিয়ে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাঁরা আধুনিক জীবন-পদ্ধতির সঙ্গেও পরিচিত হন। সুতরাং আধুনিক জীবন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শিক্ষিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা বলা চলে। সংখ্যার দিক থেকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় খুব অল্প হলেও, আদিবাসী সমাজে তাঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁদেরই একটি অংশ স্বতন্ত্র আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবিকে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর। স্বাভাবিক কারণেই দরিদ্র, অবহেলিত আদিবাসীদের মধ্যে এই দাবি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে আদিবাসীদের বিষয়ে যে সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে তাতে এই সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করা যায়। এই কারণে আদিবাসী সমাজের ক্ষোভের কারণগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দেশ ভাগের পরবর্তীকালে আদিবাসী সমাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা আলোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় ভারতে মোট আদিবাসীর সংখ্যা ছিল এক কোটি নব্বই লক্ষ। তখন ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির কিছু বেশী (৩৬১,০৮৮,০৯০)। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৫·৩৫ ভাগ ছিল আদিবাসী।

আদিবাসী জনসমষ্টির শতকরা ৯০·৬৪ ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন, আর বাদবাকী অংশ নানান ধরনের শ্রমের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়, তখন আদিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় তিন কোটির কিছু বেশী (৩০·১ মিলিয়নস)। তখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪ কোটি (৪৩৯.২৩৪,৭৭১) অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৬·৯ ভাগ ছিল আদিবাসী। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী আদিবাসী জনসংখ্যা হল চার কোটির কিছু বেশী (৪,১১,৪৭,৯২২)। এই সময়ে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫ কোটি (৫৪,৮১,৫৯,৬৫২)। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬·৯৪ ভাগ ছিল আদিবাসী। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল :

	তপসিলী উপজাতি
ভারতবর্ষ	৪,১১,৪৭,৯২২
স্টেট্‌স :	
অন্ধ্রপ্রদেশ	২২,২৬,০৮৬
আসাম	১৬,০৬,৬৪৮
বিহার	৪৯,৩২,৭৭১
গুজরাট	৩৭,৫৬,৭০০
হারিয়াণা	—
হিমাচল প্রদেশ	১,৪.,৬৪৭
জম্মু এবং কাশ্মীর	—
কর্নাটক	২,৬২,০৭০
কেরালা	১,৯৩ ১৩২
মধ্যপ্রদেশ	৯৮,১৪,৬০৬
মহারাষ্ট্র	৩৮,৪০,৬৫৮

মণিপুর	৩,৩৪,৪৬৬
মেঘালয়	৮,১৪,২৩০
নাগাল্যাণ্ড	৪,৫৭,৬০২
ওড়িষা	৫০,৭৫,৪৯১
পাঞ্জাব	—
রাজস্থান	৩১,৩৫,৩৯২
সিকিম	৫১,৬৪৩
তামিল নাড়ু	৪,৫০,৪৭৩
ত্রিপুরা	৪,৫০,৫৪৪
উত্তরপ্রদেশ	১,৯৮,৫৬৫
পশ্চিমবঙ্গ	২৬,০২,৬৭৩
	তপসিলী উপজাতি
ইউনিয়ন টেরিটরিস্ :	
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১৮,১৭৯
অরুণাচল প্রদেশ	৩,৬৯,৪০৮
চণ্ডিগড়	—
দাদরা এবং নগর হাভেলি	৬৪,৪৪৫
দিল্লি	—
গোয়া, দমন এবং দিউ	৭,৬৫৪
লাক্ষাদ্বীপ	২৯,৫৪০
মিজোরাম	৩,১৩,২৯৯
পণ্ডিচেরী	—

সর্বভারতীয় আদিবাসী জনসংখ্যার এই চিত্র সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার চিত্রটি স্পষ্ট করে দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আদিবাসী জনসমষ্টি বাস করেন। তাঁদের এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায় : সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ম্রু (Mru), মেচ্, লেপচা ও ভুটিয়া। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের

আদিবাসি জনসমষ্টির অবস্থান সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল :

জেলা	সাঁওতাল	ওঁরাও	মুণ্ডা	ম্রু (Mru)	মেচ	লেপচা	ভুটিয়া	মোট তপসিলী উপজাতি
পশ্চিমবঙ্গ	৮৪৫,৩৯৫	১০৩,২৯৬	৮২,৯২৩	৪,৬৯৬	১০,৭৮৭	১৩,৪৩০	৪,৮১০	১,১৬৫,৩৩৭
বর্ধমান ডিভিসন	৫৯৯,৭১৯	১৫,৯৬৬	৯,৬৪০	২,৮৩৭	—	৩৫	১৪৪	৬২৮,৩৪১
বর্ধমান	১২৭,৪৪১	৪,৫৫৫	২,৪৪৭	১০২	—	—	—	১৩৪.৫৪৫
বীরভূম	৭৮,৪৪০	৮০২	১৭৫	—	—	—	—	৭৯,৪১৭
বাঁকুড়া	১৩৭,৬৫৯	২৮৭	২৩৪	২১	—	—	—	১৩৮,২০১
মেদিনীপুর	২০২,৮৮২	৩,০৪৩	৫,০৩০	১,৫৬৫	—	৩	১	২১২,৫৫২
হুগলি	৪৮,৯৩৩	৫,৭০৬	১,২৯৩	১,১৩৮	—	৩১	১৪২	৫৭,২৪৩
হাওড়া	৪,৩৬৪	১,৫৭৩	৪৬১	১১	—	১	—	৬,৪১০
প্রেসিডেন্সী ডিভিসন	২৪৫,৬৭৬	৮৭,৩৩০	৭৩,২৮৩	১,৮৫৯	১০,৭৮৭	১৩,৩৯৫	৪,৬৬৬	৫৩৬,৯৯৬
২৪ পরগণা	২৩,০০২	২০,৪২৮	১৭,৬২৭	৬০৩	—	২৩	১৮	৬১,৭০১
কলিকাতা	১৬৬	৫২	৮৬	৮	—	৭	১৪	৩৩৩
নদীয়া	৬,২৩৪	৩,৩৮১	১,৩৭১	২	—	—	—	১০,৯৮৮
মুর্শিদাবাদ	২১,৮৫৩	১,২৩৯	২৩৬	১৩	—	—	—	২৩,৪৪১

জেলা	সাঁওতাল	ওঁরাও	মুণ্ডা	ম্রু (Mru)	মেচ	লেপচা	ভুটিয়া	মোট তপসিলী উপজাতি
মালদহ	৭২,৮০০	৭,৫০৩	১৩১	২৮	—	—	—	৮০,৪৬৩
পশ্চিম দিনাজপুর	৯৪,৯১০	২০,৬৭৪	৮,৩৭৪	২৩৬	—	—	—	১২৪,১৯৪
জলপাইগুড়ি	২১.৯২৮	১১৫,৭৭৬	৩৯,৪৯০	৬৭৪	১০,৫০৭	২০১	৬১৬	১৮৯,১৯২
দার্জিলিং	৩,৪৮১	১৭,২১৭	৫,৭৫২	১৯৫	২১৪	১৩,১৬৪	৪,০১৮	৪৪,০৫১
কুচবিহার	১.৩০২	১,০৬০	২১৫	—	৫৬	—	—	২,৬৩৩
চন্দননগর	২৭	৩০	৮১	—	—	—	—	১৩৯

এই তথ্যে দেখা যায় বর্ধমান ডিভিসনে আদিবাসীদের সংখ্যা বেশী। তার মধ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলাতেই তাঁদের বসতি বেশী, তারপরে বীরভূম ও হুগলি জেলার স্থান। প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলাতেই বেশী সংখ্যক আদিবাসী বাস করেন। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রতি জেলাতেই বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হল প্রায় ৫ কোটি, তার মধ্যে ২৬ লক্ষের কিছু বেশী হল আদিবাসী। এই কয় বছরে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন্ কোন্ অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রয়েছে তাও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস থেকে উল্লেখ করা হল :

স্থানের নাম	স্টেটস্	মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ আদিবাসী
ময়ূরভঞ্জ জেলা	ওড়িষা	৬০.৬
সুন্দরগড় জেলা	,,	৫৮.১
কোরাটপুর জেলা	,,	৬১
ঝাবুয়া	মধ্যপ্রদেশ	৮৪.৭
ধর	,,	৫১.০৮
মান্দলা জেলা	,,	৬২
শাহ্দল জেলা	,,	৫১.৪
সুরগুজা জেলা	,,	৫৫.৫৯
বস্তর জেলা	,,	৭২
(ক) সমগ্র রাঁচি জেলা, পালামৌ জেলার লাতেহার মহকুমা, সিংভূম জেলার চাইবাসা মহকুমা	বিহার ,,	৬৬
(খ) সাঁওতাল পরগণার গোড্ডা মহকুমার ২টি অঞ্চল, পাকুড় মহকুমার ৪টি অঞ্চল, রাজমহল মহকুমার ৪টি অঞ্চল	,,	?

উল্লেখযোগ্য এই যে, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ওড়িষা ও মধ্য-প্রদেশ এই পাঁচটি রাজ্যেই আদিবাসীদের প্রাধান্য রয়েছে। মধ্য-

প্রদেশের ঝাবুয়া জেলা থেকে বিহারের সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত একটি আদিবাসী অঞ্চল প্রসারিত। ওড়িষার তিনটি জেলার আদিবাসী প্রাধান্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরে কোঁকরাঝাড় থেকে লখিমপুর পর্যন্ত প্রতি থানা অঞ্চলে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু। দেশ-ভাগের পর ত্রিপুরায় আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। ভারতের আরও কয়েকটি অঞ্চলে আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন।

এবার দেখা যাক, দেশ-ভাগের পর আদিবাসীদের অবস্থার কতটা উন্নতি ঘটেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তপসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের উন্নতি-কল্পে অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। এমন কি সংবিধানেও তাঁদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তপসিলী সম্প্রদায় ও তপসিল উপ-জাতিদের জন্য পরিকল্পনার বছরগুলিতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা এখানে উল্লেখ করা হল :

	সময়কাল	টাকা কোটি খরচ
প্রথম	১৯৫১-৫৬	৩০'০৪
দ্বিতীয়	১৯৫৬-৬১	৭৯'৪১
তৃতীয়	১৯৬১-৬৬	১০০'৪০
বাৎসরিক পরিকল্পনা সমূহ (Annual Plans)	১৯৬৬ ৬৯	৬৮'৫০
চতুর্থ	১৯৬৭-৭৪	১৭২'৭০
পঞ্চম (outlay)	১৯৭৪-৭৮	২৮৮'৮৮
বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য (for sub-plans for tribal areas)		১২০'০০

এমন কি পরিকল্পনার বাইরেও রাজ্যসরকারগুলি তাঁদের উন্নয়ন-

কল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। পঞ্চম পরিকল্পনায় আদিবাসীদের উন্নতির জন্য কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার প্রধান কথাই হল: (ক) আদিবাসী অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে তাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা (খ) আদিবাসীদের জীবনের মান উন্নত করা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সরকার নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে গ্রামের ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চলের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। প্রত্যেক রাজ্যেই 'আদিবাসী কল্যাণ' দপ্তর গড়ে তোলা হয়। 'পঞ্চায়েতি রাজ' (১৯৫৯ খ্রী), 'পাইলট প্রজেক্ট ফর ট্রাইবাল ডেভলপমেণ্ট' (১৯৭১-৭২ খ্রী), ভূমি সংস্কার, শিল্পের প্রসার ইত্যাদি আদিবাসীদের জীবনকে কতটা উন্নত করতে সক্ষম হয় আমরা পরে উল্লেখ করব।

সংবিধানের যে সব ধারায় তপসিলী সম্প্রদায় ও তপসিলী উপজাতীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় তা হল: ১৬ (৪); ৩৩৪ (ক,খ); ৩৩৫, ৩৩৮ (১,২, ৩); ৩৩৯ (১,২), ৩৪১ (১,২) এবং ৩৪২ (১,২)। ৩৩৮ ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, একজন স্পেশাল অফিসার প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হবেন। তাঁর দায়িত্ব হল সংবিধানের ধারা অনুযায়ী তপসিলী সম্প্রদায় ও তপসিলী উপজাতিদের সমস্যাসমূহ অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং এই বিষয়ে প্রেসিডেণ্টকে অবহিত রাখা। প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব হল, তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তা অবশ্য পার্লামেণ্টকে জানাতে হবে। উপরন্তু সংবিধানের পঞ্চম তপসীলে আদিবাসী অঞ্চলের আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্যপালের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার বলে তিনি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধান সভার যে-কোন আইনের প্রয়োগ বাতিল করে দিতে পারেন এবং তিনি কোন অঞ্চলকে আদিবাসী অঞ্চলরূপে ঘোষণা করতে পারেন। এই বিষয়ে

রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি ট্রাইবাল কাউন্সিল গঠন করা হয়। রাজ্যপাল এই কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনীত করেন। কিন্তু এই সদস্যদের মধ্যে সেই অঞ্চলের আদিবাসী এম. পি এবং এম. এল. এরা অবশ্যই থাকবেন। সংবিধানের এই সব ধারা ও পঞ্চম তপসীল যে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তার মস্ত বড় প্রমাণ হল আদিবাসী অঞ্চল সমূহের বর্তমান আন্দোলন ও সংঘাত, আর বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সম্প্রসারণ। সংবিধানের বিধি-ব্যবস্থা গ্রন্থেই মুদ্রিত আছে, বাস্তবে তার আর কোনই প্রতিফলন হয়নি; আর তা হয়নি কোন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলেই।

একইভাবে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রভূত অর্থ ব্যয় আদিবাসী সমাজের প্রকট দারিদ্র দূর করতে সক্ষম হয়নি: তাছাড়া তাঁদের অবস্থারও উন্নতি সাধন করে জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে পারেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে আদিবাসীদের অবস্থা কেমন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৯০.৬৪ ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, আর বাদবাকীরা বিভিন্ন ধরনের শ্রমের কাজে নিযুক্ত। আজ পর্যন্ত এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদ, একচেটিয়া ধনিক, কালোবাজারী, সুদখোর মহাজন এবং ভূমিগ্রাসী জমিদার-জোতদার তাঁদের ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও দিন-মজুরে পরিণত করেছে, আর তাঁদের অস্তিত্ব ও বিকাশ বিপন্ন করে তুলেছে। ভূমি-সংস্কার, শিল্পের প্রসার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে আদিবাসীরা কেন আরও দুঃখ-বেদনার আবর্তে পড়ছেন, এই নিয়ে আমাদের প্রশাসনযন্ত্রের কোনই মাথা-ব্যথা নেই। কোন আদিবাসী অঞ্চলে বা তার সংলগ্ন স্থানে ভারী শিল্পের পত্তন হলে তাতে আদি-বাসী সমাজ কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা আমাদের তথাকথিত

'বিশেষজ্ঞরা' মনে রাখেন না অথবা তা প্রয়োজন মনে করেন না। তাই আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই, শিল্পের প্রসারণ আর আদিবাসী জীবনের করুণ চিত্র। অথচ কৃষির ও শিল্পের প্রসারের পরিকল্পনাগুলিকে যদি আদিবাসী ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জনসমষ্টির সামগ্রিক চিত্র সামনে রেখে করা হত, তাহলে হয়তো এই কাঠামোর মধ্যেও তাঁদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি করা যেত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হত না। কোন সুনির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থ ব্যয় করা হয়নি বলেই আদিবাসী সমাজ তাতে উপকৃত হননি। তাই অজস্র অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও তাঁরা আজও প্রকট দারিদ্র ও অশিক্ষার পঙ্কিল আবর্তে আবদ্ধ আছেন। জাতীয় শ্রম কমিশন কর্তৃক গঠিত অনুশীলন দলের সমীক্ষা থেকে রাঁচি ও তার আশেপাশের এলাকায় যে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে তাতে আদিবাসীদের অবস্থার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত একজন বিশেষজ্ঞ লেখেন: "যদিও এইসব শিল্পসমষ্টি গড়ে উঠবার ফলে দেশের অর্থনীতি ও শিল্পের বিকাশ ঘটছে, তবু এর ফলে এইসব শিল্পাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের সমাজে ভাঙন এসেছে। বৃহদায়তন শিল্প সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে গড়ে তোলা হয়, আদিবাসী এলাকায় এগুলি গড়ে উঠলেও আদিবাসী সমাজের কল্যাণের কোন সচেতন প্রয়াস এর পেছনে থাকে না। এর ফলে আদিবাসী সমাজে অপ্রত্যাশিত ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই নেমে এসেছে।" এই সব শিল্প বিকাশের ফলে আদিবাসীরা তাঁদের চিরাচরিত উপজীবিকা, জমি, বাসস্থান, পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ক্রমশ হারিয়েছেন। তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে বেকারী ও শ্রমের বাজারে বাহিরাগতদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা। শিল্প গড়ে ওঠার সময়ে তাঁদের মনে যে আস্থার সঞ্চার হয়েছিল, অচিরেই প্রচণ্ড আশাভঙ্গে তার

পরিণতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বাসভূমি থেকে, জীবিকা ও শ্রমের বহু পুরাতন ব্যবস্থা থেকে উচ্ছেদ না করে এবং একই সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতির উপর আঘাত না হেনে, শিল্পের পুঁজিবাদী বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা সম্ভব নয়। আদিবাসী জীবনের এই বিপর্যয় পুঁজিবাদী বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি বলা চলে।

শিল্পের পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে সহায়ক অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা আদিবাসী সমাজের প্রতি কতটা উদাসীন তার পরিচয় পাওয়া যায় রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে কর্মরত আদিবাসী কর্মচারীর সংখ্যা থেকে। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কর্মরত ১৪,৮০৭ কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৭৮০ জন ছিলেন আদিবাসী, আবার তাঁদের মধ্যে ৬১১ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সমস্ত সরকারী শিল্প-ক্ষেত্রের চাকরিতে তপসিলী আদিবাসীর স্থান নিম্নরূপ ছিল :

মোট কর্মচারীর সংখ্যা	আদিবাসীর সংখ্যা	শতকরা হার
১৪০,৩৫০	২,০৩২	১'৪৪

এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরিতে তপসিলী আদিবাসীদের স্থান এইরূপ ছিল :

শ্রেণী	কর্মচারীর মোট সংখ্যা	আদিবাসী কর্মচারীর সংখ্যা	শতকরা হার
১ম	২২,২৯৬	৭৪	০'৩৩
২য়	৩৫,৪১৮	৮৭	০'২৫
৩য়	১১,৩৬,৪৭৫	১৩,৪৯৯	১'১৯
৪র্থ	(ঝাড়ুদার বাদে)		
	১১,৬৩,৫৯৩	৪১,৫১৭	৩'৫৭
মোট	২৩,৫৭,৭৮২	৫৫,১৭৭	২'৩৪

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী এবং অন্যান্য বিভাগে তপসিলী আদি-

বাসীদের চাকরি পাবার বিষয়ে কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রগুলি কতটা সাহায্য করে তার হিসেব ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় :

কর্মখালির বিজ্ঞাপনের সংখ্যা			তপসিলী আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা	তপসিলী আদিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ পদের সংখ্যা
	+		×	××
কেন্দ্রীয় সরকার	রাজ্য সরকার	অন্যান্য বিভাগ		
১,৭২,২১৭	৩,২৫,১৭৪	৩,৫৫,০৬৬	৪৬৮৮	১,২৯৯

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত সরকারের কারিগরী শিক্ষা প্রকল্প অনুসারে ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্‌স্টিট্যুটে তপসিলী আদি-বাসীদের স্থান নিম্নরূপ ছিল :

ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পে শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় আদিবাসীর শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার তুলনায় আদিবাসীর শতকরা হার
মোট	আদিবাসী		
৯৬.২১১	২,২৫০	২·৩৪	৬·৯

এই সব তথ্যের সঙ্গে যদি আমরা আদিবাসীদের ঋণের বোঝা, শঠ মহাজন কর্তৃক তাঁদের জমি দখল এবং আদিবাসী অর্থনীতিতে মহাজনদের আধিপত্য যুক্ত করি তাহলে আদিবাসী জীবনের এক করুণ চিত্র আমাদের সামনে পরিস্ফুট হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে কোন অগ্রগতি হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'আদিবাসী কল্যাণ'-এর জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজে জ্ঞানের আলো মোটেই প্রবেশ করতে পারেনি। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের

সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮১ জন, তার মধ্যে শতকরা ০·১০ জন ম্যাট্রিকুলেশন অথবা তার উপরে ছিলেন, প্রাইমারী বা জুনিয়ার বেসিক ছিলেন শতকরা ১·৬০ জন, নাম স্বাক্ষর করতে পারেন শতকরা ৪·৮৫ জন এবং নিরক্ষর ছিলেন শতকরা ৯৩·৪৫ জন। চা-বাগান অঞ্চলের আদিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমরা যে সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত আদিবাসী মানুষের পরিচয় পাই তা আবার মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠী বা গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাদবাকী আদিবাসী গ্রুপগুলি এখনও প্রায় নিরক্ষর অবস্থায় রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ এই কথাও মনে রাখতে হবে, সমগ্র আদিবাসী সমাজের বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে আজও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আসেনি। চা শ্রমিক সহ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯৫ জন আদিবাসীর জীবনে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নেই। গত ত্রিশ বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃ ভূমিহীনের সংখ্যা ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রাইবাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলেপমেণ্ট স্কীম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মোট কথা, আদিবাসী জীবনে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনবার সবগুলি পরিকল্পনাই প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলা চলে। আদিবাসী সমাজের যে অংশ শিক্ষা লাভ করে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাঁরাই সুযোগ-সুবিধাগুলির বেশীর ভাগ ভোগ করে নিজেদের অবস্থাকে উন্নত করেন। এই শিক্ষিত প্রভাবশালী ক্ষুদ্র অংশের মধ্য থেকেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠছে। তাঁরাই দরিদ্র-নিরক্ষর আদিবাসীদের এই পথে মুক্তি অর্জনের আহ্বান জানাচ্ছেন। আদি-বাসী সমাজের অগ্রসর ও অনগ্রসর অংশের অবস্থান তাই গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বত্রিশ বছর পরেও কেন অগ্রসর শিক্ষিত আদিবাসী সমাজ সমগ্র দেশের ঐক্যের পটভূমিতে তাঁদের উন্নতির প্রশ্ন না ভেবে পৃথক সত্তার বৃত্তে তাঁদের ভাবনা-চিন্তাকে রূপায়িত করছেন? অন্যদিকে বৃহত্তর হিন্দু

সমাজের বুদ্ধিজীবীরাই বা কেন এত বছর ধরে পশ্চিমের সমাজতত্ত্বের বা নৃতত্ত্বের উন্নত বিদ্যা ও আধুনিক টেকনোলজি আয়ত্ত করা সত্ত্বেও এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি ? আর কি কারণেই বা আদিবাসী সমাজের স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক দাবি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পুষ্ট করছে ? কি কারণে জাতীয় সংহতি, ভ্রাতৃত্ব এবং সম-অধিকারের নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হল না ? এইসব প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করলেই ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন হল : উপরে উল্লিখিত আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করা কি সম্ভব ? ত্রিপুরা রাজ্যের মত কোথাও হয়তো রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত জেলা গঠন করা যেতে পারে। যেমন আদিবাসীরা বিহারে যে অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা এবং ওড়িষার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি জেলা। কিন্তু সমগ্র অঞ্চলের জনসংখ্যার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এখানে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু। তাই এই অঞ্চল নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন করলেও আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হবে না। আর তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাকে যুক্ত করলেও এই সমস্যার কোন সুস্থিত সমাধান হবে না। উপরন্তু সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে আদিবাসী জনসমষ্টি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে এক অস্বাভাবিক আলোড়নের সৃষ্টি হবে : তার ফলে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও বিপর্যস্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসমষ্টির অবস্থান লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার গড়নে পৃথক আদিবাসী অঞ্চল গঠনের প্রয়াস যে জটিলতার সৃষ্টি করবে তাতে সকলের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলেই আমার ধারণা। বিহারে যে দুটো পৃথক অঞ্চলের কথা এখানে উল্লেখ করেছি সেখানে দুটো পৃথক স্বায়ত্তশাসিত জেলা গঠন করা যেতে পারে বিহার রাজ্যের মধ্যে। মধ্যপ্রদেশে এই

রকম তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করা সম্ভব। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের সঙ্গে শুধু ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার প্রশ্নই যুক্ত নয়, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও যুক্ত। তাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়।

তাহলে কোন পথে আদিবাসী সমাজের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব? এক কথায় বলা চলে আদিবাসী জনসমষ্টির সঙ্গে অন্য জনসমষ্টির সম্মিলিত প্রয়াসেই পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। তার জন্য উভয় অংশের অগ্রণী অংশকে দায়িত্ব নিতে হবে। মৌলিক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ও শিল্পের প্রসার করে আদিবাসী সমাজের ও অন্যান্য অবহেলিত অংশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব। একই সঙ্গে শিক্ষার প্রসারণ ঘটাতে হবে, আর তার মাধ্যমে যুক্তিশীল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক-মানবিক ভাবধারায় জনসমাজকে গড়ে তুলতে হবে। আদিবাসী জনসমষ্টির ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করে, তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে, সমগ্র ভারতীয় জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে আমাদের সকলের জীবনকে এক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে না। এই দায়িত্ব পালনে আদিবাসী ও অন্য সবাইকে এক সঙ্গে চলতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

এই প্রবন্ধ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা উল্লেখ করা হলঃ ১৯৫১, ১৯৪৯ ও ১৯৫১, খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ : Census 1951, West Bengal, The Tribes and Castes of West Bengal by A. Mitra, Calcutta, 1953; The Gazetteer of India, Vol. I, New Delhi, 1956; India A Reference Annual, 1951, 1953 & 1956; আদিবাসী আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে (এই পুস্তিকার ভবানী সেন, এ. বি. বর্ধন ও চিন্ময় ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ) কলিকাতা, ১৯৫১,।

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে

ভারতের সঙ্গে চীন-ভারত-বর্মার সংযোগস্থল আসামে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বহুজাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর অধিবাসীদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন নৃ-জাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর পরিচিতি এখানে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কম বেশী বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্দো-মোঙ্গোল, অস্ট্রিক, ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। যদিও এর মধ্যে ইন্দো-মোঙ্গোল জাতি গোষ্ঠীর প্রভাবই বেশী।[১] অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ইন্দো-মোঙ্গোল অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে এ অঞ্চলে আর্যদের প্রভাব পড়তে সুরু করে।[২] প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার গঠনে আসাম কখনই পশ্চাৎপদ থাকেনি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসাম প্রদেশের আবির্ভাব নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ঘটেছে।

অসমীয়া সাহিত্যের সর্বাধিক পরিণতির প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় আসামের ইতিহাসে পুরাকালে আসাম 'প্রাগ্‌জ্যোতীষ' নামে পরিচিত ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতে তার উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান গৌহাটির প্রাচীন নামই ছিল 'প্রাগ্‌জ্যোতীষপুর'। ক্লাসিক্যাল ও মধ্যযুগে এই রাজ্য কামরূপ নামে পরিচিত হয়। চতুর্থ শতকের এলাহাবাদ শিলালিপিতে কামরূপের উল্লেখ আছে। 'কালিকা পুরাণ' (দশম শতক) ও 'যোগিনীতন্ত্রে' (ষোড়শ শতক) আসামের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতের সময় থেকে ভাস্কর বর্মনের আমলের (৫৯৩-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্ব পর্যন্ত আসামের ইতিহাসের অনেক ঘটনাই সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানের অভাবে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে।[৩] বর্মন রাজবংশের আমলে (৩৫০-৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) কামরূপের ইতিহাসে 'ক্লাসিক্যাল

যুগের' সূচনা হয়।[৪] অনেক নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন এ যুগের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বন। ভাস্কর বর্মনের শাসনকালেই প্রখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ পরিভ্রমণ করেছিলেন। আসামের ইতিহাসে মোঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর বোডোদের বিশেষ ভূমিকা র'য়েছে। এরাই প্রথমে আর্যভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত অসমীয়া ভাষাকে নিজেদের ভাষ হিসাবে গ্রহণ করে ও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৫] পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে আসামের প্রাক্ হিন্দু আমলের কল্পিত উপকথা, কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক গল্প নানাভাবে মিশে যায় এখানে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। তাছাড়া আসামে তান্ত্রিকতারও বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

কয়েকশত বছর ধরে আসামে প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্য কচ্, অহম ও চুতিয়াদের মধ্যে বিরোধ চলে। নিম্ন আসাম ও বাংলার নিকটবর্তী অঞ্চলে কামতা রাজ্য ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষ ও চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন দুর্লভ নারায়ণ। পঞ্চদশ শতকে খেন্ রাজারা প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং এই বংশের শেষ রাজা নিলাম্বর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। দীর্ঘ অবরোধের পর হোসেন শাহ রাজধানী কামতাপুর দখল করেন। অন্যদিকে কোচবিহারকে রাজধানী করে রাজা বিশ্বসিংহ কোচ্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বসিংহের পুত্র নারায়ণ (১৫৩৩-১৫৮৭) ছিলেন এই রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত ও শক্তি-শালী রাজা। কালক্রমে এই রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে নানা অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে (১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে) অহমদের উত্তর বর্মা ও চীন সীমান্তের অঞ্চল থেকে অনুপ্রবেশ ঘটে ও আসামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত যুগ হচ্ছে আসামের ইতিহাসে অহমদের প্রাধান্য বিস্তৃতির যুগ। এমনিভাবে

বোডোদের ও অন্যান্য পার্বত্য উপজাতিদের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়।[৬] অহমরা হচ্ছে ভোট-চীন (Sino-Tibetan) জাতি গোষ্ঠীর মানুষ। সে সময়ে উচ্চ আসামের বিরাট অংশ জুড়ে চুতিয়াদের প্রাধান্য ছিল। আর কাছারীদের অধীনে ছিল শিবসাগরের পশ্চিম অংশ. ধানসিরি উপত্যকা ও নওগাঁও জেলার বৃহত্তর অঞ্চল। এদের সঙ্গে অহমদের বিরোধ ঘটে। কালক্রমে অহমরা গোটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, এমনকি উত্তর ও দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে পর্যন্ত, আধিপত্য স্থাপন করে। অবশ্য চুতিয়াদের পরাজিত করে অহমরা স্বাধীন কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও, অহমরাজারা প্রায়ই নাগা, কাছারী ও কোচদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তাছাড়া অহমদের শাসনের আমলেই মুগল সৈন্যবাহিনী চৌদ্দবার আসাম আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবারই অহম সৈন্যবাহিনী মুগলদের পরাজিত করে। ঔরঙ্গজেবের জেনারেল ও ঢাকার গবর্ণর মীর জুমলা আসাম আক্রমণ করেও দখল করতে পারেননি। সপ্তদশ শতকে গৌহাটি ছিল মুসলিম ও অহম সৈন্যবাহিনীর বিরোধের ক্ষেত্র। আসামের প্রখ্যাত জেনারেল লাচিত বরফুকন ঔরঙ্গজেবের জেনারেল রাজা রাম সিংহকে পরাজিত করেন। আসামের এই বিপদে ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে কোচ, কাছারী ও অহমরা যুক্তভাবে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।[৭]

অহম রাজাদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এদের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়তে সুরু করে।[৮] অহমরা অষ্টাদশ শতকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৯] অহম রাজা সুদাংফা বামুনি কাওয়ার (১৩৭৯-১৪০৭)-এর আমলে প্রথমে হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়ে। জয়ধ্বজ সিংহ (১৬৪৮-১৬৬৩) হচ্ছেন প্রথম অহম রাজা যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন।[১০] অহমরা প্রায় ছয়শত বছর ধরে আসাম শাসন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ-

প্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে অহম্ রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্মীয়া আসাম আক্রমণ করে এবং আহোম্ সিংহাসন দাবীকারী দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রকে বর্মীরা ১৮১৭-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আসাম হতে বিতাড়িত করে। আর বর্মীরা এত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায় যে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইয়ান্দাবু চুক্তি' অনুসারে বর্মীরা আসামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তারপর থেকে আসামে বৃটিশ শাসনের যুগ সুরু হয়।

রাজনৈতিক ইতিহাসের এই ঘটনা সংঘাতের মধ্যেই অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। প্রশ্ন হল এই অঞ্চলের নাম 'আসাম' হবার কারণ কি? পূর্বে এই অঞ্চলের দুটো সংস্কৃত নাম ছিল, যথা, প্রথমে 'প্রাগজ্যোতীষ' এবং পরের দিকে 'কামরূপ'। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষভাবে বৃটিশ আমলে এই অঞ্চলের নাম করণ হয় 'আসাম'। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে এ নামকরণের উদ্ভব বিশেষ গবেষণার বিষয়। অহম্‌রা ছিল ভোট-চীন জাতির 'থাই' শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 'থাই' জাতির লোকদের 'অসম' নামে উল্লেখ করত। ক্রমশ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহম্‌দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে গোটা অঞ্চলের নামকরণ হয় 'আসাম'।[১১] কিভাবে 'থাই' জাতির লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'অসম' শব্দের প্রয়োগ হল, তার সঙ্গত ব্যাখ্যা এখনও হয়নি।[১২] ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি লিখেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে অহম্‌রা নিজেদের নামেই এই অঞ্চলকে উল্লেখ করবে। তিনি লিখেছেন: "The word Assam or Asam is another form of the tribal name Aham or Ahom, which are modification of the original name of the Ahom people, Rham."[১৩] এ প্রসঙ্গে জি. এ. গ্রীয়ারসন-এর উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"The name is said to be the term given by them to the shans or 'shams' who commenced invading the country from the East in the thirteenth century, and whose ancient language is still called 'Ahom'. This word is popularly, but incorrectly derived from the Assamse word aham, which means 'unequalled', being the same as the Sanskrit asama''.[১৪]

অসমীয়া ভাষা আর্য-ভাষা। ডঃ বি. কে. বড়ুয়ার মতে সপ্তম শতকে সংস্কৃত ভাষা থেকে এই অসমীয়া ভাষার বিকাশ ঘটে।[১৫] হিউয়েন সাঙ মধ্যভারতের ভাষার সঙ্গে কামরূপ ভাষার যে কিছু পার্থক্য রয়েছে তার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬] অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে 'পূর্ব মগধী অপভ্রংশ' থেকে। অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তাহলেও এ দুটো ভাষার স্বতন্ত্র বিকাশ ও সাহিত্যিক জীবন রয়েছে। উড়িয়া ভাষা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে বাংলা ভাষার ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর 'প্রাচীন অসমীয়া' ও 'প্রাচীন বাংলা' দেখে মনে হয় যেন একই ভাষা।[১৭] তবুও অসমীয়া ভাষাকে বাংলা ভাষার 'প্রশাখা' বলা চলে না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের লেখা 'চর্যাগীতি' ও 'দোহা' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। এই 'চর্য্যাগীতি' ও 'দোহা'র মধ্যে অসমীয়া ভাষারও প্রাচীনতম অনেক নিদর্শন রয়েছে[১৮] এমনকি বেহুলা-লক্ষীন্দর উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে আসামে যে সমস্ত অলিখিত জনপ্রিয় গাথা রয়েছে তার মধ্যেও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, অসমীয়া ভাষার স্বতন্ত্র স্বাধীন বিকাশ অনস্বীকার্য। তাই ডঃ বানী কান্ত কাকতী লিখেছেন:

"Thus it may be concluded that in a pre-Bengali and pre-Assamese period, there were certain dialect

groups which may be designated as Eastern Magadhan Apabhransa. They represented mixtures of many tongues and many forms. When they were reduced to writing, the authors often used parallel forms characteristic of different dialects without any discrimination, but with the development of linguistic self-consciousness, the forms were isolated and each dialect group became clearly demarcated and the parallel forms became leading characteristic of different dialect groups.'[১৯] এমনিভাবে অসমীয়া ভাষা স্বাধীন রাজাদের আমলে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষায় পরিণত হয়। 'আর্য-অসমীয়া' ভাষার বিকাশ সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জির বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বিহার ও বাংলাদেশ থেকে আসামে আর্যভাষার অনুপ্রবেশের পর ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'আর্য-অসমীয়া' ভাষার উদ্ভব ঘটে।[২০] তাছাড়া অসমীয়া ভাষার মধ্যে অস্ট্রিক ও ভোট-চীন ভাষার প্রভাবও বিদ্যমান।

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আর এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই অসমীয়া ভাষার পূর্ণতর বিকাশ ঘটে। ত্রয়োদশ শতকের শেষ ও চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভ থেকে ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কে অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন বা প্রথম যুগ বলা হয়। আবার এই সময়ের সাহিত্যের দুটো প্রধান শাখা রয়েছে যথা, 'প্রাক-বৈষ্ণব যুগ' ও 'বৈষ্ণব যুগ'। সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কে অসমীয়া সাহিত্যের 'মধ্যযুগ' বলা হয়। এই যুগে অহম্ রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে অসমীয়া গদ্যের বিকাশ ঘটে। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে 'আধুনিক যুগ' সুরু হয়। অসমীয়া গদ্যে বাইবেল অনুবাদ ও বৃটিশ

শাসনের মধ্য দিয়ে এ যুগের সূচনা ঘটে।[২১]

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে কামতারাজ দুর্লভ নারায়ণ অসমীয়া ভাষার বিকাশে সাহায্য করেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল এই ভাষার অনুশীলনের কেন্দ্র। কামতা রাজারা কবি ও লেখকদের অসমীয়া ভাষায় লিখতে অনুপ্রেরণা যোগান। এই রাজ্যের প্রখ্যাত সভাকবি ছিলেন হরিহর বিপ্র। তিনি 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' ও 'লব-কুশের যুদ্ধ' নামক কাব্য রচনা করেন। 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' কবিতায় কামরূপের বীর রাজা দুর্লভনারায়ণের প্রশস্তি রয়েছে। তিনি জৈমিনি মহাভারত থেকে এ দুটো কাব্যের কাহিনী নিয়েছিলেন।[২২] হরিহর বিপ্রের সমসাময়িক কবি হেম সরস্বতী 'প্রহ্লাদ-চরিত' কাব্যে দুর্লভনারায়ণের প্রশংসা করেছেন। তিনি 'বামন-পুরান' থেকে গল্প সংগ্রহ করে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। এ কাব্যে ভগবদ্ভক্তির প্রকাশ রয়েছে। হেম সরস্বতীর বৃহত্তর কাব্য 'হরগৌরী-সংবাদ'এ নয়শত কবিতা আছে। 'পুরাণ' ও আসামের লোকগীতি থেকে তিনি এ কাব্যের গল্প সংগ্রহ করেছেন। কিছু কিছু কবিতায় যৌগিক ক্রিয়া-কলাপেরও উল্লেখ আছে।[২৩]

ঠিক এবই সময়ে কাছারী রাজাদের সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় বর্তমান নওগাঁও জেলা শিক্ষা-সংস্কৃতির আর একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাক্-বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে মাধব কন্দলী প্রখ্যাত ব্যক্তি। চতুর্দশ শতকে কাছারী রাজা মহামাণিক্য সভা-কবি মাধব কন্দলীকে সাহায্য ও উৎসাহ দেন। মাধব কন্দলী সংস্কৃত রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবিরাজ কন্দলী নামেও পরিচিত। কবিদের মধ্যে যিনি রাজা তাঁকেই বলা হয় কন্দলী। মাধব কন্দলী অনূদিত রামায়ণের প্রভাব শঙ্করদেব ও তাঁর পরবর্তীদের উপর বিশেষভাবে পড়ে। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম মাধব কন্দলী কর্তৃক বাল্মিকীর রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় রচিত হয়। হিন্দী, বাংলা ও

উড়িয়া ভাষায় রামায়ণ রচনা হয় আরও অনেক পরে।[২৪] ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বর্জন করে, কবিসুলভ মন নিয়ে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নূতন যুগের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ধর্ম বাঙালী জাতিকে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে আসে ও নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত করে। বাংলাদেশের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভক্তিধর্মের প্রভাব পড়ে। আসামেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্ত্তন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। আসামে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন শঙ্করদেব। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বরদোয়ার এক শাক্ত কায়স্থ প্রধানের পরিবারে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য বয়সেই তাঁর পিতা-মাতা মারা যান। বার বছর বয়সে স্থানীয় পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর কাছে তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর তাঁর বিবাহ হয়। পড়াশুনার সঙ্গে ভুঁইয়া প্রধান হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। নিকটবর্তী কাছারী উপজাতির সাথে অবিরাম বিরোধে তিনি খুবই ক্লিষ্ট বোধ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী এক মেয়ে রেখে মারা যান। এই ঘটনা তাঁর জীবনে গভীর ছাপ রেখে যায়। ভুঁইয়া হিসাবে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে ৩১ বছর বয়সে পুরী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। শঙ্করদেব উত্তর ভারত ভ্রমণের সময় কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষায় কিছু গান রচনা করেন। অবশ্য পাঠ্যাবস্থায় তিনি 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। বার বছর পর বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর জীবনের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলেন।[২৫] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং ভুঁইয়া হিসাবে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। ইতিমধ্যে তিনি 'ভাগবত পুরাণ' সংগ্রহ করেন এবং অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। নিজে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত-জ্ঞান ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য অসমীয়া ভাষায় লিখিত সুরু করেন। ভক্তিধর্মের সুবিধার্থে তিনি অসমীয়া ভাষায় অনেক মূলগ্রন্থ, টীকা ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬] তাছাড়া তিনি অনেক গান, কবিতা ও নাটক রচনা করেন। শীঘ্র ভুঁইয়া হিসাবে দায়িত্ব পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শঙ্করদেব প্রবর্তিত এই নতুন ধর্মের প্রভাব আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা এই বৈষ্ণবধর্মকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেয়। শঙ্করদেবের সমর্থকদের নানাভাবে পীড়ন করা হয়। বৈষ্ণবধর্মের বিরোধীরা শঙ্করদেব ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অহম্ রাজা সুমুঙ্গকে (১৪৯৭-১৫৩৯) উত্তেজিত করে। এমনকি শঙ্করদেবকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। অবশ্য তিনি সসম্মানে মুক্ত হন। তাহলেও অহম্ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতা চলতেই থাকে। শঙ্করদেব ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়। শিষ্য মাধবের পরামর্শ অনুসারে শঙ্করদেব আত্মগোপন করেন। মাধব ও শঙ্কর-দেবের জামাতা হরি ভুঁইয়া ধৃত হন। বিচারে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়। হরিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, আর মাধবকে নয়মাস বন্দী রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়[২৭] এই ঘটনার পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শঙ্করদেব অহম্‌রাজ্য পরিত্যাগ করে কোচ্‌রাজ্যে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সেখানেও বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকেরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন। ভাগবত নিয়ে আলোচনা ও ভাগবত থেকে অনুবাদ করার জন্য শঙ্করদেবকে ব্রাহ্মণরা কোচ্‌রাজা নরনারায়ণের কাছে অভিযুক্ত করেন। এত সব বাধা সত্ত্বেও বৈষ্ণবধর্মের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অবশেষে কোচ্‌রাজা নরনারায়ণের সাথে শঙ্করদেবের

বন্দুত্ব হওয়ার পর বৈষ্ণবরা নিশ্চিন্ত হন। আসামে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশে নরনারায়ণের বিশেষ অবদান রয়েছে।[২৮] ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচ্‌বিহারেই শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়।

শঙ্করদেব কৃষ্ণচরিত্র ও রামচরিত্র অবলম্বনে বহুপদ ও 'নাট' বা যাত্রাপালা রচনা করেন। তিনি ভগবানের স্তুতিতে 'কীর্ত্তন' নামক যে গীতি কবিতা রচনা করেন তার প্রভাব উত্তর ভারতের তুলসী-দাসের রামচরিত মানসের মত আসামের হিন্দুগৃহে আজও বিদ্যমান।[২৯] অসমীয়া সাহিত্যের অন্য দুটো শাখা অর্থাৎ 'আঙ্কিয়া-নাট বা একাঙ্ক নাটিকা ও 'বরগীত' বা ভক্তিমূলক সঙ্গীত শঙ্করদেবের রচনায় সমৃদ্ধ। 'আঙ্কিয়া নাটের' ঐহিক ও আধ্যাত্মিক আবেদন রয়েছে। তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। তাই শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার অভিপ্রায়ে কীর্ত্তন ও অভিনয়ের সাহায্যে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এভাবে নাট-গীতের মাধ্যমে জনমানস গড়ে তোলেন।[৩০] আঙ্কিয়া নাট আসামের সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়ক হয় ও পরবর্তীকালে এ ধারার ক্রমপরিণতি ঘটে আসামের গান, নৃত্যকলার বিকাশে, আর জাতীয় নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠায়। শঙ্করদেব রচিত নাটকগুলোর মধ্যে 'কালিয়াদমন', 'কেলিগোপাল', 'পত্নীপ্রসাদ', 'রাস-ক্রীড়া', 'রুক্মিনী হরণ', 'পারিজাত হরণ', 'রামবিজয়', প্রভৃতির প্রভাব এখনও বর্তমান।[৩১] শুক্লধ্বজ ছিলেন নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি। তঁরই উৎসাহে শঙ্করদেব কর্তৃক 'রামবিজয়' নাটক রচিত হয়। রামরায় নামক কোন কোচ্‌ সামন্তের উৎসাহে 'রুক্মিনী-হরণ' ও 'কেলিগোপাল' নামক নাটকদ্বয় রচিত ও অভিনীত হয়। নাটকের ভিতরের যে গীত, যা 'আঙ্কিয়া গীত' নামে খ্যাত, তা নৃত্য-নাট্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রাচীন তিনটি অংশে অর্থাৎ অহমৃরাজ্য, কামরূপ ও কোচবিহার অঞ্চলে বৈষ্ণব লেখকদের নাটগীত ছড়িয়ে পড়ে। আর একটি ধারা হচ্ছে 'বরগীত'। উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ঐতিহ্যের প্রকাশ এই 'বরগীত'-এর মধ্যে হয়েছে। ভক্তিধর্মের উপাসনার কাজে এই 'বরগীত' বা ভক্তিমূলক সঙ্গীত গীত হয়। শঙ্করদেব অনেক 'বরগীত' রচনা করেন। এই 'বরগীত' শীঘ্র খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শঙ্করদেবের পরে অনেকেই 'বরগীত' রচনা করেন। তারমধ্যে মহিলা লেখিকাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়।[৩২]

বৈষ্ণব সাহিত্য এভাবেই সমৃদ্ধ হয়। শঙ্করদেবের প্রিয় শিষ্য মাধবদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্মীমপুরের লেটেকুপুখুরি নামক স্থানে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ছিলেন শাক্ত। শঙ্করদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোচবিহারে মারা যান। এ সময়ে কোচ রাজা ছিলেন নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। শঙ্কর-দেবের পর মাধবদেবকেই আসামে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উভয়েই 'ভাটিমা' (স্তুতি) নামক অনেক গান রচনা করেন। তাছাড়া মাধবদেব কৃষ্ণলীলাত্মক বহুপদও রচনা করেন। তিনি 'আঙ্কিয়া নাট' ও 'বরগীত' রচনা দ্বারাও খ্যাতি অর্জন করেন। এসব নাটক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মধ্যে কৃষ্ণের জীবনের নানাদিক পরিস্ফুট হয়েছে। গান ও নাটক ছিল বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান উপায়। নাটকের পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাধবদেব শঙ্করদেব থেকে কিছুটা ভিন্ন রীতি অনুসরণ করেন। মাধবদেব 'ঝুমুর' নামক গীতি-নাটিকার প্রবর্ত্তন করেন। অসমীয়া, মৈথিলি ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষাও নাটকে ও সঙ্গীতে ব্যবহৃত হত। মাধব-দেব 'অর্জ্জুন-ভঞ্জন', 'করধরা', 'পিম্পরগুচ্ছ', 'ভূমিলুতিয়া', 'রাস-ঝুমুর', 'ভোজন ব্যবহার', 'ব্রাহ্মমোহন', 'ভূষণচরণ' এবং 'কোটর খেলোয়া' প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি 'নামঘোষ' নামক কাব্য

রচনা করে অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৩৩] এ কাব্যই বৈষ্ণব কবির সবচেয়ে বড় অবদান। এ কাব্য 'হাজারিঘোষ' নামেও পরিচিত (যেহেতু এ কাব্যে এক হাজার শ্লোক আছে)। পবিত্র ধর্মশাস্ত্র হিসাবে 'নামঘোষ'কে গণ্য করা হয়।[৩৪] 'নামঘোষে'র অনেক স্তোত্রে অনুতাপ, প্রার্থনা, আত্ম সংযম, আত্ম-তিরস্কার এবং ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস সম্পর্কে রয়েছে। আর প্রত্যেক স্তোত্রেই গীতি প্রধান। চিন্তার গভীরতা, বিশ্বজনীন আবেদন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সঙ্গীত মুখরতা এ কাব্যের মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা মাধবদেবের কাব্য প্রতিভার পরিচায়ক।

আসামের বৈষ্ণবধর্ম দৃঢ় অনুরাগ ও আত্মনিবেদনের দিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ায় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে এখানে ততটা আলোচনা হয়নি।[৩৫] তাহলেও বৈষ্ণব চিন্তাধারা ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য কিছু রচনা পাওয়া যায়। যেমন, শঙ্করদেব রচিত 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'ভক্তি-প্রদীপ', মাধবদেব রচিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'নামঘোষ', ভট্টদেব রচিত 'ভক্তিসার' ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'ভক্তি বিবেক', রামচরণ ঠাকুর রচিত 'ভক্তি রত্ন', নরোত্তম ঠাকুর রচিত 'ভক্তি প্রেমাবলি', এবং গোপাল মিশ্র রচিত 'ঘোষ-রত্ন'।[৩৬]

বৈষ্ণব কবিদের উপর ভাগবত-পুরাণ, ভাগবত-গীতা, মহাভারত প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব আছে। গল্প-উপাখ্যান ইত্যাদি তাঁরা এসব গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করতেন। প্রখ্যাত কবি রাম সরস্বতী রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর ভ্রাতার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের অসমীয়া সংস্করণ রচনা করেন। লোকসাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাম সরস্বতী 'ভীমচরিত' এবং শ্রীধর কন্দলী 'কংখোয়া' রচনা করেন। মাধবদেবের অনুকরণে গোপালদেবও পদ রচনা করেন। অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে ও জনপ্রিয় করে তোলার বিষয়ে মহাভারতের অনুবাদ বিশেষভাবে সহায়ক হয়। অসমীয়া লেখকেরা এ মহাকাব্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

শঙ্করদেব ও মাধবদেব গীতা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু গীতার গোটা অংশের অনুবাদ তখনও হয়নি বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য (১৫৫৮-১৬৩৮। ইঁনি ভট্টদেব নামেই পরিচিত) মূল 'ভাগবত-গীতা' ও 'ভাগবত-পুরাণ' অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করেন ভট্টদেব অনূদিত 'ভাগবত কথা'(১৫৯৪-৯৬) এবং 'গীতা-কথা' (১৫৯৭-৯৮) অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।[৩৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গীতার এ অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। কামরূপের অধিবাসী গোবিন্দ মিশ্রের গীত অনুবাদে কাব্যিকগুণ পুরোপুরি বজায় রয়েছে। গোপালচরণ দ্বিজ অসমীয়া গদ্যে 'ভক্তি রত্নাকর কথা' (১৬০০) রচনা করেন। এভাবেই শঙ্করদেব ও মাধবদেব অনুসরিত অসমীয়া ব্রজবুলি গদ্যের পরিবর্তে অসমীয়া গদ্য একটা ছন্দ বা প্রবাহ আনয়ন করেন সুলেখক ভট্টদেব ও গোপালচরণ দ্বিজ। ভট্টদেবকে অসমীয়া গদ্যের জনক বলা হয়। উভয় লেখকই অসমীয়া গদ্যে সাহিত্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন[৩৮] অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের বিকাশে এ পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব চরিত ও অহমদের সময়ানুক্রমিক ইতিবৃত্তে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের আরও বিকাশ ঘটে।

অসমীয়া বৈষ্ণবদের 'ছত্র' (মঠ বা আখরার মত) আসামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অসমীয়া সাহিত্যে 'ছত্রে'র অবদানও যথেষ্ট। 'ছত্রে'র তত্ত্বাবধানে শঙ্করদেবের জীবন চরিত যা 'চরিত-পুঁথি' নামে উল্লেখযোগ্য তা রচিত হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য বৈষ্ণব সাধুদের নিয়েও জীবন-চরিত রচনা করা হয়। ভক্তরা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভের আশায় এ সমস্ত জীবন-চরিত থেকে বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করতেন। মাধবদেব প্রথমে এ প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর গুরুদেব শঙ্করদেবের জীবনচরিত থেকে প্রতিদিন আবৃত্তি করতেন। 'কথাগুরুচরিত' নামে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবনচরিত গদ্যে রচিত হয়। বৈষ্ণব

কবিতার আদর্শ এতটা প্রভাব বিস্তার করে যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে শাক্তদের রচনা এবং অহম্ ও কোচদের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত এ কবিতার অনুকরণে রচিত হয়।[৩৯]

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব ও অহম্ যুগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। অহম্ রাজাদের আমলে রাজসভার খুবই জাঁকজমক ছিল। এ সময়ে গরগাঁও, রঙ্গপুর, জোড়হাট ও গৌহাটি প্রভৃতি স্থানকে কেন্দ্র করে ছোট ও বড় অনেক শহর গড়ে ওঠে। ফলে আলাপ ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবন-যাপন ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে শহুরে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। অভিজাত ও অর্থবান্ অহমরা এবং শহরের শিক্ষিত অধিবাসীরা এ নূতন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের রক্ষণশীল স্থবির জীবনের সঙ্গে এ নূতন জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এই শহরকে কেন্দ্র করেই এ যুগে অসমীয়া শিল্পকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। অহম্ রাজা, মন্ত্রী ও অভিজাত সামন্তরা কবি এবং লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এঁদের মধ্যে জমিজমা বিতরণ করেন। এ সমস্ত উদার পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে রামমিশ্র, কবিরাজ চক্রবর্তী, রুচিনাথ কন্দলী, বিদ্যাচন্দ্র কবিশেখর স্তুতিগর্ভ গীতি কবিতা রচনা করেছেন।[৪০] এ যুগে সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষণীয়। বৈষ্ণবযুগের সাহিত্যে আত্মনিগ্রহ ও দারিদ্রের আদর্শ এতটা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে জীবনের অনেক সহজ-স্বাভাবিক অনুভূতি অবদমিত থেকে যায়। অন্যদিকে অহম্ আমলের লেখকেরা জীবনের সহজ-স্বাভাবিক দিকেই তুলে ধরেন। আর অহম্ রাজ-সভা ছিল রোমান্সের কেন্দ্র। রাজা ও রাণীরা ভগবদ্ভক্তি মূলক উপাখ্যানের পরিবর্তে প্রেমের কাহিনীই বেশী পছন্দ করতেন। সুতরাং কবি ও লেখকদের রচনায় প্রেমের কাহিনীই প্রধান অবলম্বন হয়। সাহিত্যে সহজ-স্বাভাবিক মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই বৈষ্ণব যুগের সাহিত্যের অপার্থিবতা ও অধ্যাত্মবাদের

পরিবর্তে অহম্‌দের সময়ে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রকাশ দেখা দেয়।[৪১]

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'বুরঞ্জী' বা অহম্‌ রাজসভার ইতিবৃত্ত এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। এ সব ইতিবৃত্তকে ভিত্তি করেই আধুনিক অসমীয়া গদ্যের উদ্ভব হয়। রাজা, সামন্ত প্রভু এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্দেশে 'বুরঞ্জী' সঙ্কলিত হত। রাষ্ট্রীয় দলিলাদি ভিত্তি করেই এ ইতিবৃত্ত রচিত হত। প্রধানত যে তথ্যাদি দলিল হিসাবে গণ্য করা হত তা হচ্ছে সামরিক অধিনায়ক ও সীমান্ত গবর্ণরদের রিপোর্ট, বিদেশী ও মিত্র রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক পত্রালাপ, রাজা ও মন্ত্রীদের নিকট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত বিচারবিভাগীয় ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ-পত্র, রাজসভার প্রতিদিনের কাজকর্ম ও আলোচনা এবং বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁদের সম্যক জ্ঞান ছিল তাঁরাই সমস্ত ইতিবৃত্ত রচনায় দায়িত্ব নিতেন। বেশ কিছু 'বুরঞ্জী'র রচয়িতা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা। এর ভাষা ছিল লালিত্যপূর্ণ। ভাবাবেগের সুযোগ মোটেই এ ধরণের রচনাতে নেই। কারণ প্রামাণ্য তথ্যাদি নিয়েই ছিল লেখকদের কারবার। 'বুরঞ্জী' বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। এ ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্পর্কে জি. এ. গ্রীয়ারসন বলেছেন যে, দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে 'বুরঞ্জী' সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অসমীয়া ভদ্রলোকদের কাছে একান্তই অপরিহার্য ছিল। প্রতিটি প্রখ্যাত পরিবার, সরকার ও রাজকর্মচারীরা সমসাময়িক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রাখতেন।[৪২] তাছাড়া ইতিবৃত্ত রচনা করা ছিল পবিত্র কাজ। সুতরাং পরমেশ্বরকে যথারীতি প্রণাম জানিয়ে এ রচনা আরম্ভ করাই ছিল প্রথা। প্রথম দিকে অহম্‌ শাসকেরা অহম্‌ ভাষাতেই ইতিবৃত্ত রাখতেন। কিন্তু অসমীয়া প্রজাদের কাছে এ ছিল বিদেশী ভাষা। তাই বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। কিছুদিন অহম্‌ ও অসমীয়া উভয় ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করা

হয়। পরবর্তীকালে এ নীতি পরিহার করে সম্পূর্ণভাবে অসমীয়া ভাষা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ইতিমধ্যে অহমদের সঙ্গে আর্য-ভাষা-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটে। অহমরা আর্য-ভাষাগোষ্ঠীর অসমীয়া ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে।

সাধারণত 'বংশাবলী' নামে পরিচিত আর এক ধরনের ঐতিহাসিক সাহিত্য গদ্য ও পদ্যে রচিত হত এতে রয়েছে বিভিন্ন রাজাদের বংশ বৃত্তান্ত ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। তাছাড়া প্রখ্যাত সামন্ত প্রভুদের বংশ ও জীবন বৃত্তান্তও আছে। রাজাদের কাছ থেকে যে সমস্ত সামন্ত পরিবারগুলো জমিজমা পেতো বা সামন্তরা যে সব সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকতো সে বিষয়ে তথ্যাদি এরমধ্যে পাওয়া যায়। 'বুরঞ্জী'র মধ্যে এ সব তথ্য নেই। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে 'দরাং-রাজ-বংশাবলী' খুবই বিখ্যাত। দরাং-এর কোচ্ রাজা সমুদ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ অষ্টাদশ শতকের শেষে পদ্যে 'দরাং-রাজ-বংশাবলী' রচনা করেন। প্রাচীন কোচ্ শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য তথ্য এতে রয়েছে। মূল হস্তলিখিত 'দরাং-রাজ-বংশাবলী'র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য সুন্দর চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে।[৪৩]

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ মূল সংস্কৃত থেকে অসমীয়া গদ্যে অনূদিত হয়। সংস্কৃত ভাষাতেও কিছু গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তাছাড়া অসমীয়া গদ্যে নানা বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচিত হয়। স্থাপত্য শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃত্যকলা ও পশুজগতের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শিবসিংহ এবং তাঁর স্ত্রী রানী অম্বিকাদেবীর নির্দেশে সুকুমার বরকত 'হস্তিবিদ্যার্ণভ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে হস্তী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। 'অশ্বনিদান' (ঘোড়া সম্পর্কে আলোচনা), 'শ্রীহস্ত মুক্তাবলী' (নৃত্যকলা সম্পর্কে), 'ভাস্বতী'

(জ্যোতিবিজ্ঞানের উপরে) এবং 'কিতাবত মঞ্জুরী' (অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে) নামক গ্রন্থাবলী অসমীয়া ভাষায় রচিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে জ্যোতিষীর উপর আলোচনা রয়েছে। হস্তলিখিত পুস্তক চিত্রের দ্বারা সুশোভিত করা হত। এ সব চিত্রকলা কেবল ধর্মমূলক ছিল না, রাজসভার নানা ঘটনাবলী চিত্রকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 'দরাং রাজ-বংশাবলী'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ', 'সংখ্যাসুরবধ', 'ভাগবত', 'হস্তিবিদ্যার্ণভ' প্রভৃতি গ্রন্থ চিত্রশোভিত [৪৪]

চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও কুহক মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদির মাধ্যমে রোগনির্ণয় ও রোগ উপশমের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এমনকি অহম্ ইতিবৃত্ত ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করার জন্য এবং অত্যাচারী রাজ কর্মচারীদের মেরে ফেলবার জন্য মন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। ফলে মন্ত্রের উপর গদ্যে ও পদ্যে অনেক পুঁথি পাওয়া যায়, যেমন, 'সপর ধরণী মন্ত্র', 'করাতি মন্ত্র', 'সর্বধক্ মন্ত্র', 'কামরত্নতন্ত্র', ভূতের মন্ত্র', ও 'ক্ষেত্র মন্ত্র' ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে বিখ্যাত।[৪৫] এ সবের সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রতিফলিত করে।

আসামে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্ম-বিশ্বাসের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এ সময়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে অনেকেই জীবনাহুতি দিয়েছিলেন। আর অনেক বীরত্ব-ব্যাঞ্জক ঘটনার পরিচিতিও মেলে। অসমীয়া সংস্কৃতিতে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে এ সময় থেকে আসামের জীবন ও সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। ফলে অসমীয়া ভাষায় 'জিকির' ও 'জারি' গান রচিত হয়। এ ক্ষেত্রে পীর ও ফকিরদের অবদানও যথেষ্ট। এমনি করেই অসমীয়া ভাষায় অনেক আরবী-

ফারসী শব্দ ঢুকে পড়ে।[৪৬]

লোক সাহিত্যের দিক থেকেও আসাম খুব সমৃদ্ধশালী। আসামে বিভিন্ন ধরণের লোকসঙ্গীত প্রচলিত। 'বিহু-গীত' (বিহু উৎসবের গান), 'বিয়ানাম' (বিবাহের গান), 'মালিতা' (গাথা), ধর্মীয় সঙ্গীত ও ঘুম পাড়ানি গান প্রভৃতি আসামে খুবই জনপ্রিয়।[৪৭] তাছাড়া কিছু ঐতিহাসিক গাথাও রয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মনিরাম দেওয়ান আসাম থেকে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় ও মনিরাম দেওয়ানকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ ঘটনার বিবরণ গাথার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে।[৪৮] আধুনিক কালের আসামের জাতীয় আন্দোলনের অনেক ঘটনাই লোকসঙ্গীত ও গাথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্ম হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্মারাম শর্মার সহযোগিতায় শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা অসমীয়া ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়[৪৯] ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে বৃটিশ শাসন সুরু হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অসমীয়া মাসিক পত্রিকা 'অরুণোদয়'-এর আবির্ভাব ঘটে। উচ্চ আসাম থেকে আমেরিকান মিশনারীরাই এ পত্রিকা বের করেন। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ভিত্তি এভাবেই স্থাপিত হয়। তারপর স্বল্পায়ু নিয়ে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অনেক লেখকেরা অসমীয়া ভাষায় গ্রন্থ ও ইস্তাহার রচনা করেন। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য গড়ে তোলার ব্যাপারে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বড়ুয়া ও যজ্ঞরাম বড়ুয়া প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনি করে বহু লেখকের রচনায় অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১ Assam and India by Dr. Suniti Kumar Chatterjee, in A Souvenir on Aspects of the Heritage of Assam, edite dby

Prof. K. N. Dutt, Published by Dr. H. K. Barpujari, Local Secretary, 22nd Session, Indian History Congress, Gauhati, December, 1959, p 1.

২ Ibid. pp 2-3.

৩ Ibid, p. 2.

৪ The Background of Assamese Architecture by Raj Mohan Nath in Aspects of the Heritage of Assam, p. 9.

৫ Assam and India by Dr. Suniti Kumar Chatterjee, p. 2-3.

৬ Ibid, p. 4.

৭ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, in Aspects of the Heritage of Assam, p. 65.

৮ Ibid, p. 64.

৯ Assam and India by Dr. Suniti Kumar Chatterjee, p. 4.

১০ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, p. 64.

১১ Dr. Banikanta Kakati, Assamese, Its Formation and Development, pp. 1-3

১২ Ibid, p. 2.

১৩ Assam and India by Dr. S K. Chatterjee, p. 4.

১৪ G. A Grierson, Linguistic Survey of India, vol V, part I, p. 393.

১৫ Assamese Language and Early Literature by Dr. B. K. Barua. p. 56.

১৬ Dr. Banikanta Kakati, Assamese, Its Formation aud Development, p. 5.

১৭ Assam and India by Dr. S. K. Chatterjee, p. 3.

১৮ Dr. B K. Kakati, Assamese, Its Formation and Development p. 10.

১৯ Ibid, p. 11.

২০ Assam and India by Dr. S. K Chatterjee, p. 3.

২১ Dr. B. K. Kakati . Assamese, Its Formation and Development, pp. 11-15. Vide also Aspects of Early Assamese Literature, General Editor B. K. Kakati, pp. 4-5.

২২ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, p. 57.

২৩ Ibid, p. 57.

২৪ Ibid, p. 58.

২৫ The Vaisnava Renarissance in Assam by Dr. Maheswar Neog. in Aspects of the Heritage of Assam. pp. 31-32.

২৬ Ibid, p. 32.

২৭ Ibid, p. 33.

২৮ Ibid, pp. 33-34.

২৯ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, p. 59.

৩০ Ibid, pp. 59-60.

৩১ Ibid, p. 60.

৩২ Ibid.

৩৩ The Vaisnava Renaissance In Assam by Dr. Maheswar Neog, p. 44

৩৪. Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, p. 61.

৩৫ Ibid, p. 62.

৩৬ Ibid,

৩৭ Ibid,

৩৮ The Vaisnava Renaissance in Assam by Dr. Maheswar Neog p. 44.

৩৯ Ibid, p. 45 Vide also The Satra Institution of Assam by Dr. S. N. Sarma, pp. 50-55.

৪০ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, p. 66.

৪১ Ibid, pp. 66-67.

৪২ G. A. Grierson ; Linguistic Survey of India, vol. V. Part I p. 396.

৪৩ Assamese Language and Early Assamese Literature by Dr. B. K. Barua, pp. 67-68.

৪৪ Ibid, pp. 68-69.

৪৫ Ibid, p. 68.

৪৬ Ibid, pp. 65-66.

৪৭ Folk Literature of Assam by Dr. Praphulla Dutta Goswami. in Aspects of the Heritage of Assam, pp. 70-75.

৪৮ Ibid, p. 76.

৪৯ G. A. Grierson ; Linguistic Survey of India, vol. V. Part I p. 397.

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার অবদান

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন আসামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও, অসমীয়া সাহিত্যের বর্তমান পটভূমি আলোচনা করতে হলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শুরু করা দরকার। কারণ ঐ বছরেই অসমীয়া ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বাইবেল শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীরা বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করলেও ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে অসমীয়া ভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে ইংরেজিতে রবিনসন প্রণীত অসমীয়া ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর তাঁদের উদ্যোগেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগরে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। 'প্রাক-অরুণোদয় যুগে' অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মিশনারীদের প্রধান ভূমিকা থাকলেও অসমীয়া লেখকেরাও পিছিয়ে থাকেননি। বিশ্বেশ্বর বৈদ্যাধিপের 'বেলিমারর বুরঞ্জী, (১৮৩৩-১৮৩৮ খ্রী), মনিরাম দেবানরের 'বুরঞ্জী বিবেকরত্ন' (১৮৩৮ খ্রী), যজ্ঞরাম ডেকা বরুয়ার প্রথম 'অসমীয়া অভিধান' (১৮৩৯ খ্রী) ও কাশীনাথ তামুলী ফুকনের 'অসম বুরঞ্জী' (১৮৩৪ খ্রী) ইত্যাদি গ্রন্থ তারই পরিচয়। এই যুগে অসমীয়া সাহিত্যের যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তা আরও সমৃদ্ধ হয় 'অরুণোদয় যুগে' (১৮৪৬-১৮৮২ খ্রী)। মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম অসমীয়া মাসিক পত্রিকা 'অরুণোদয়' ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগর মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাগজ অসমীয়াদের দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত করায়, আসামে পাশ্চাত্য ভাবধারার বীজ বপন করে, অসমীয়া ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে,

অসমীয়া লেখকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায় এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মিশনারীরাই মৃতপ্রায় অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন জীবন দান করেন। 'অরুণোদয় যুগের' প্রখ্যাত লেখক, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯ খ্রী) মধ্য আসামের কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করে এই নূতন অসমীয়া সাহিত্যের গাড়া পত্তন করেন। তারপর এগিয়ে এলেন আরও দুই শক্তিধর লেখক হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-১৮৯৬ খ্রী) ও গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-১৮৯৫ খ্রী)। এঁরা দুজনেই বহু বিষয়ে লিখেছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় অসমীয়া লেখকেরা যেমন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তেমনি তাঁরা বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ থাকায় বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতাতে শিক্ষালাভ করেন। স্বভাবতই তাঁরা এই দ্বৈত প্রভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অসমীয়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সমৃদ্ধি ঘটান।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানকল্পে যে আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তার কেন্দ্রস্থলও ছিল কলকাতা। এখানে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী অসমীয়া যুবকেরা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা' নামে একটি আলোচনা-চক্র স্থাপন করেন। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল : (ক) আসামের পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করে প্রকাশ করা, (খ) আসামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসমীয়া প্রচলন করা, (গ) শুদ্ধ ব্যাকরণ আর বর্ণবিন্যাস প্রচলন করা, (ঘ) আসামের সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতির বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও বুরঞ্জী প্রণয়ন করা, (ঙ) সাহিত্য ও পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করা। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করতে এই সভার উদ্যোক্তারা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জোনাকী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই কাগজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, পদ্মনাথ বরুয়া, সত্যনাথ

বরা, কনকলাল বরুয়া প্রভৃতি লেখকেরা। 'জোনাকী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা; তিন বছর পর লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া 'জোনাকীর' সম্পাদক হন। 'জোনাকী'র নাম থেকেই এ যুগকে বলা হয় 'জোনাকীর যুগ'। আর চন্দ্রকুমার, লক্ষ্মীনাথ ও হেমচন্দ্র এই তিনজনকে বলা হয় 'জোনাকী যুগের ত্রিমূর্তি'। 'অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা'র, প্রধান উদ্যোক্তাও ছিলেন এই তিনজন। 'জোনাকী'র পৃষ্ঠপোষকদের রচনায় রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব পড়ে। এই রোমান্টিক প্রভাব বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের মারফত অসমীয়া সাহিত্যে প্রবেশ করে। তাই অসমীয়া সাহিত্যের এই স্তরকে 'রোমান্টিক প্রভাব' (১৮৯০-১৯৪০ খ্রী) নামেও অভিহিত করা হয়। এই যুগে অসমীয়া সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ —কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, জীবনচরিত, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা—বিভিন্ন লেখকের অবদানে উৎকর্ষতা লাভ করে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া হলেন এই যুগের অন্যতম লেখক।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শিবসাগরের এক সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা দীননাথ ছিলেন মুন্সেফ। নগাঁও থেকে বরপেটায় বদলি হওয়ায় দীননাথ সপরিবারে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে ভাটিতে যাবার পথে আহঁতগুরির নিকটে নৌকাতেই লক্ষ্মীনাথের জন্ম। সেজন্য রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনী 'মোর জীবন সোঁওরণ'-এ লিখেছেন—এই জীবন সোঁওরনের লেখক 'ভূমিষ্ঠ নহৈ নৌকাস্থ হল'। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্মীনাথ উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এসেম্বলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

লক্ষ্মীনাথ তখন কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল হাওড়ায় অবস্থান করেন এবং হাওড়ার অণারেরী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। বার্ড নামক ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গেও তিনি যৌথ-ভাবে কারবার চালান। কাঠের ব্যবসা উপলক্ষে ওড়িষার সম্বলপুরেও তাঁকে থাকতে হয়। সেখানে পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্যও তিনি নির্বাচিত হন। তাঁর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষ্মীনাথ সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতার সাথে সাথে বৈষয়িক ব্যাপারেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরমাল্য লাভ করেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, রূপকথা, রসরচনা, জীবনচরিত ও প্রবন্ধ ইত্যাদি মিলিয়ে ৩৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। অসমীয়া সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই তাঁর কীর্তি উজ্জ্বল।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সাহিত্যিক জীবন সুরু হয় 'জোনাকী'র সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন। ঐ কাগজেই তাঁর প্রথম রচনা 'লিতিকাই' নামক হাস্যোদ্দীপক প্রহসন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি আরও তিনখানি প্রহসন রচনা করেন, যথা:—'নোমল' (১৯১৩ খ্রী) 'চিকরপতি নিকরপতি' (১৯১৩ খ্রী) ও 'পাচনি' (১৯২৩ খ্রী)। অসমীয়াদের সামাজিক আচরণের অসঙ্গতি ছিল তাঁর প্রহসনগুলোর বিষযবস্তু। কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলোর প্লট বা কাহিনী খুবই দুর্বল। পরিস্থিতিসমূহ বহুক্ষেত্রেই উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত। অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরস পরিবেশন সার্থক হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অনেক বেশী। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 'জয়মতী কুয়ঁরী' ও 'বেলিমার' বিয়োগান্ত, এবং 'চক্রধ্বজসিংহ' মিলনান্ত ঐতিহাসিক নাটক। রাণী জয়মতী তাঁর স্বামী ও দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মদান করেন। সেই কাহিনী নিয়েই এই নাটক। আসামের আর এক গৌরবময় অধ্যায়ের ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'চক্রধ্বজ-

সিংহ' নাটক। স্বর্গদেও চক্রধ্বজসিংহের রাজত্বকালে মুঘলরা আসাম আক্রমণ করে। তখন আসামের বিখ্যাত জেনারেল লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বে অসমীয়া সৈন্যবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘল আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে। লাচিত বরফুকনের যুদ্ধরীতি ও স্বদেশহিতৈষণা, অসমীয়া সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং রাজা চক্রধ্বজ সিংহের মহত্ত্ব অতি নিপুণভাবে লেখক ব্যক্ত করেছেন। উপর্যুপরী তিনবার বর্মীদের আক্রমণের ফলে অহম্ সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে হয় তারই কাহিনী 'বেলিমার' নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব নাটকে লক্ষ্মীনাথ কল্পনার রং মেখে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিকৃত করেননি। তখন নাটকের প্রচলিত ভাষা ছিল পদ্য। কিন্তু তিনি গদ্যের প্রচলন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লক্ষ্মীনাথ সেক্স্পীয়রের নাটকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কি অবস্থায় আসামে নাট্য সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে তার যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে আসামেও কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অসমীয়া ভাষায় আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কোন নাটক ছিল না। স্বভাবতই বাংলা নাটক অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করা হত। কিন্তু আসামের নবীন জাতীয়তাবোধ তাতে পরিতৃপ্ত হয়নি। 'জোনাকী যুগের' লেখকেরা এই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরাই আসামের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে নাটকের মাধ্যমে রূপায়িত করেন এবং অসমীয়াদের নিজেদের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার নাটকের চরিত্র চিত্রণে ও সংলাপ রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা চোখে পড়লেও এদিক থেকেই তাঁর নাটকের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা উচিত। অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত অসমীয়া সাহিত্যের দিক নির্ণয়রূপে গৃহীত হয়। এই কারণে শিক্ষিত অসমীয়ারা গভীর আগ্রহ সহকারে লক্ষ্মীনাথ সম্পাদিত কাগজ পাঠ করতেন। তাঁর অনেক

রচনা ও প্রবন্ধ 'বাঁহী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৯-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনাথ নিজের সম্পাদনায় এই কাগজ প্রকাশ করেন। তখন থেকে সতেরো বছর এই কাগজ অসমীয়া সাহিত্যের আন্দোলনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। একই সময়ে 'উষা' নামক আর একখানি সাহিত্যপত্র পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। এই দুটো কাগজে সাহিত্য ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে বিতর্ক হত তা অসমীয়া সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। 'বাঁহী' সম্পাদনাকালে লক্ষ্মীনাথ অনেক কবিতা রচনা করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কবিতা-সঙ্কলন 'কদমকলি' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার ভাব ও ছন্দ অসমীয়া কবিতাকে নতুন রূপ দান করে। তাঁর অনেক কবিতাই রোমান্টিক ধর্মী। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তাতে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার আর একটি প্রধান সুর হল স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগ। 'বীণবরাগী', 'অসম সঙ্গীত', 'অ মোর আপনদেশ', 'ব্রহ্মপুত্র' ইত্যাদি কবিতায় তিনি আসামের অতীত গুণ-গরিমা ব্যক্ত করেছেন এবং দেশবাসীকে সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগুতে আহ্বান জানিয়েছেন। এক গভীর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সাথে রোমান্টিক ভাবাবেগ মিশ্রিত হয়ে এই কবিতাগুলো মাধুর্য-মণ্ডিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি গান আসামের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে ('অ মোর আপনার দেশ।')।

প্রাক-জোনাকী যুগের লেখকদের প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গী বিশেষ উন্নত ছিল না। 'জোনাকী যুগে' মননধর্মী, ব্যক্তিনিষ্ঠ ও রসাত্মক প্রবন্ধের সূত্রপাত হয়। প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যই ছিল রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমীয়া গদ্য রচনাকে পুরানো আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত করে পরিস্ফুট ও গতিশীল করেন। তাঁর রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, ব্যঙ্গ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম এই ধরনের প্রবন্ধ অসমীয়া সাহিত্যে প্রচলন করেন

এবং এইসব রচনার মাধ্যমে অসমীয়া সমাজের আবিলতা দূর করতে তৎপর হন। চেষ্টারটনের মত তিনিও প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি একটি নতুন রীতি অনুসরণ করেন। তাঁর যে চারখানি রস-রচনা সমগ্র আসামে প্রচলিত, তা হল: 'কৃপাবর বরবরুয়ার কাকতর টোপলা', 'কৃপাবর বরবরুয়ার ওভতনি', 'বরবরুয়ার ভাবর বুরবরণি' ও 'বরবরুয়ার বুলনি'। এই সব রচনায় সমসাময়িক জীবন ও সমস্যা নিয়ে মননশীল আলোচনা রয়েছে।

রম্যরচনা ছাড়াও লক্ষ্মীনাথ জীবনী, সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কীয় বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কয়েকখানি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থের নাম এখানে দেওয়া হল: 'মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব এবং শ্রীমাধবদেব', 'মোর জীবন সোঁওরণ', 'তত্ত্বকথা', 'শ্রীভাগবৎ কথা', 'শ্রীকৃষ্ণ কথা', 'কামত কৃতিত্ব লভিবর সঙ্কেত', 'ভারতবর্ষের বুরঞ্জী', 'অসমীয়া ভাষা আর সাহিত্য'। বিভিন্ন প্রবন্ধে ও জীবনী গ্রন্থে লক্ষ্মীনাথ ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য বুরঞ্জী বা ইতিবৃত্ত রচনার ঐতিহ্য বহুদিন ধরেই আসামে প্রচলিত। এই ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করেই অসমীয়া গদ্যের উদ্ভব হয়। অসমীয়া-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন লক্ষ্মীনাথ এই ধারাটিকে পরিবর্তিত পরি-বেশেও অব্যাহত রাখেন। পিতা দীননাথের জীবনচরিত, বেজবরু-য়ার বংশাবলী, আত্মচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে।

এই সময়ে উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রতি লেখকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা ওয়াল্টার স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে অনু-প্রেরণা পান। লক্ষ্মীনাথের একমাত্র উপন্যাস 'পদম কুঁয়রী' ঐতিহাসিক দুন্দুয়া বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত। কামরূপের দুজন জমিদার অহোম রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গল্পের নায়িকা পদুমের পিতা ও কাকা ছিলেন এই বিদ্রোহের অধিনায়ক। এই পরিবেশে পদুম আর সূর্যের ভালবাসা কিভাবে

ব্যর্থ হল তার কাহিনীই লেখক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা, চাঞ্চল্যজনক পরিণতি, আর অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা উপন্যাস-খানির মূল্য অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

লক্ষ্মীনাথকে অসমীয়া ছোটগল্পের জনক বলা হয়। 'সুরভি' (১৯০৯ খ্রী), 'সাধুকথার কুঁকি' (১৯১০ খ্রী), এবং 'জোনেবিরি' (১৯১৩ খ্রী) অসমীয়া সাহিত্যের 'প্রথম ছোটগল্পের সঙ্কলন গ্রন্থ' নামে পরিচিত। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর ছোটগল্প বর্তমান যুগের উপযোগী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই আসামের গ্রাম্য ও শহুরে জীবনের পট দ্রুত পরিবর্তিত হয়। একদিকে ইংরেজ রাজত্বে দুর্নীতিপরায়ণ আমলা শ্রেণীর প্রাধান্য, অন্যদিকে ভাঙ্গনমুখী, অন্তঃসারশূন্য, আভিজাত্যের ধ্বজাবহনকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আর কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত গরীব জনসাধারণ। এই সময়ে সমাজজীবনে অধঃপতন আর অসঙ্গতি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীনাথ গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার নিখুঁত ছবি ছোটগল্পে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর বেশীর ভাগ ছোটগল্প গ্রামের মধ্যবিত্ত জীবনকে ভিত্তি করে রচিত। সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের আস্বাদ তাতে পাওয়া যায়। চরিত্র সমূহ সজীব হওয়ায় তা বেশ মনোগ্রাহী হয়েছে। তিনি রোমাণ্টিক ছোট-গল্পও রচনা করেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রকাশও কয়েকটি গল্পে পাওয়া যায়। শুধু ছোটগল্পেই নয়, রূপকথা নিয়ে রচিত গ্রন্থেও তাঁর মুনসীয়ানার পরিচয় আমরা পাই ('ককা দেউতা আরু নাতিলরা', 'বুঢ়ী আইর সাধু' ও 'জুনুকা')।

সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন থাকলেও লক্ষ্মীনাথ আসামের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটিতে আসাম ছাত্র সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটিতে আসাম সাহিত্য সভার সভাপতিও ছিলেন লক্ষ্মীনাথ। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি বৈষ্ণবধর্ম চর্চায় ও

আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিমগ্ন থাকেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গাইকোয়ার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ ডিব্রুগড়ে তিনি পরলোক গমন করেন।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিকে যাঁরা আরও সমৃদ্ধ করতে চান তাঁরা প্রত্যেকেই এই প্রতিভাধর লেখকের সমগ্র রচনাবলী নতুন করে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন।

বাঁশবেড়িয়ার মন্দির

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা খুবই কষ্টকর। প্রাসাদ, মন্দির, স্তূপ ও বিহার প্রভৃতি প্রায় সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। যে কয়টা সামান্য স্থাপত্যকীর্তি পাওয়া যায় তাও ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে[১] ভাস্কর্য, পাণ্ডুলিপি, চিত্র, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও অন্যান্য লেখকদের বিবরণ ইত্যাদি থেকে প্রাচীন-কালের স্থাপত্যশিল্প সম্পার্কে ধারণা করা যায়।[২] এ সমস্ত উপাদান থেকে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণ ও গঠনরীতির পরিচয় মেলে। জানা যায় যে বাংলার স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল।[৩] তবুও নিদর্শনবিহীন এই কীর্ত্তিকে তো আর ইতিহাস বলা চলে না। অন্যদিকে বাংলার স্থাপত্যশিল্পের 'অধিকাংশই ধর্মসম্পৃক্ত'। তাই এ সবের মধ্যে 'সাধারণ লোক-মানসের প্রতিচ্ছবি' পাওয়া যায় না।[৪]

প্রাচীন শিল্পসম্পদ বিলুপ্ত হবার প্রধান কারণ হিসাবে পলিবহুল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে প্রস্তর দুর্লভ বলেই মন্দির বা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রস্তরের ব্যবহার কম হয়েছে।[৫] অধিকাংশ নির্মাণকার্যে বাঁশ, কাঠ, নল-খাগড়া ও পোড়ামাটির ইট ব্যবহৃত হতো। বাংলার শিল্পকলা ও দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে পলিমাটির প্রচলন ছিল। আর সম্ভবতঃ সেজন্যই অর্থাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টি, বন্যা ও নদনদীর তটক্ষয়ের ফলে প্রাচীনকীর্ত্তি ও গৌরব লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হয়েছে।[৬] মুসলমান আমলেও বাংলাদেশে অনেক মন্দির তৈরী হয়। এভাবেই বাংলার নিজস্ব রীতি গড়ে ওঠে এবং মন্দির স্থাপত্য রীতি শিল্পকলার দিক থেকে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করে। এর প্রভাব রাজপুত ও মুঘল স্থাপত্যরীতির উপরও পড়ে।

পোড়ামাটির কাজের জন্যই বাংলাদেশের বিশেষ সুখ্যাতি

রয়েছে।[৭] শিল্পীর কল্পনা প্রধানতঃ এখানে পোড়ামাটির মাধ্যমেই রূপ পেয়েছে। বাঁকুড়ার শ্রীধর মন্দির, বীরভূমের ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির এবং বাঁকুড়ার মদনমোহন মন্দির প্রভৃতি এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে।[৮] এই সব মন্দিরে চিত্রসারি (প্যানেল) মারফত পুরাণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।[৯] এমনভাবে শিল্পীরা মন্দিরকে সুশোভিত করেছেন যে মন্দিরের একটি সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কোথাও বিরক্তি বা ক্লান্তির উদ্রেক করে না। সেজন্য আজও ইটের এসব স্থাপত্য -কীর্তিসমূহ দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

বাঁশবেড়িয়া কিভাবে আকর্ষণীয় স্থল হলো সে আলোচনায় আসা যাক। হুগলী মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গার তীরবর্তী এ জায়গার নাম করণ 'বাঁশবেড়িয়া' হয়েছে বাঁশঝাড়ের প্রাচুর্য থেকে।[১০] বর্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামের রাঘব দত্ত রায় চৌধুরীর আমলে এই বাঁশ-বেড়িয়া গ্রামের উত্থান সুরু হয়।[১১] দিল্লীর বাদশাহ শাজাহানের কাছ থেকে তিনি 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন।[১২] তিনি ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সনদ পান। জমিদারী তদারকের সুবিধার জন্য রাঘব দত্ত প্রয়োজন বোধে বাঁশবেড়িয়াতে বসবাস করতেন। তখনও তিনি পাটুলি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বর স্থায়ীভাবে বাঁশবেড়িয়ায় বসবাস করতে থাকেন।[১৩] তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি পরিবারকে এখানে বাস করার জন্য নিয়ে আসেন। রামেশ্বর এখানে অনেক টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এভাবেই তাঁর আমল থেকে এখানে এক বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠে। রামেশ্বরের কাজে খুশি হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব 'পঞ্জপার্চা খিলাত' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। আর ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সনদ মারফত তাঁকে 'রাজা মহাশয়' উপাধি দেন।[১৪]

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ মারাঠা বা বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যতিব্যস্ত হতে থাকে।

এই বর্গীর হাঙ্গামা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে রাজা রামেশ্বর বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে অনেক খরচে রাজবাড়িবেষ্টিত গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করেন [১৫] গড়ের পরিধি ছিল প্রায় এক মাইল। এখনও গড়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু পুরানো রাজপ্রাসাদের চিহ্ন নেই। এই গড়বেষ্টিত রাজবাড়ি 'গড়বাটি' নামেই পরিচিত। ঘন বাঁশঝাড়ের বেড়বেষ্টিত রাজবাড়ি ছিল বলেই বাঁশবেড়িয়ার রাজারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। দুর্গরক্ষার্থে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য ছিল। বিপদের সময় নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরাও এই রাজবাড়িতে আশ্রয় নিতেন [১৬]

রাজা রামেশ্বর প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দু হলেও, সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। নিজে ছিলেন বিষ্ণু বা বাসুদেবের উপাসক [১৭] ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়াতে 'বাসুদেব-মন্দির' নির্মাণ করেন [১৮] পোড়ামাটির কারুকার্যের দিক থেকে এ মন্দিরটি এক অপূর্ব নিদর্শন। বহু বছরের পুরানো হলেও লাল রং-এর এ মন্দির এখনও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর কারুকার্যখচিত প্যানেলে পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী আছে, যেমন কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কংসবধ, রাসলীলা, পুতনাবধ, হংসের উপর ব্রহ্মা, ষাঁড়ের উপর শিব ও পার্বতী, গরুড়ের উপর বিষ্ণু এবং পুত্র-কন্যাসহ দুর্গা ইত্যাদি। যে প্যানেলে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর যুদ্ধরত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বল ও তেজের রূপটি খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর একটি প্যানেলে অষ্টাদশ শতকের অভিজাত শ্রেণীর ভ্রমণের এক চিত্র পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছেন, পাল্কী বাহকেরা তা নিয়ে যাচ্ছে এবং কয়েকজন মহিলা একটি গাড়ীতে বসে আছেন, আর এক জোড়া ষাঁড় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাল্কীবাহক ও পরিচারকদের মাথায় ফিরিঙ্গী টুপি রয়েছে। প্রাচীন বাংলা অক্ষরে মন্দিরের গায়ে যে একটি শ্লোক খোদাই করা হয়েছে তাতে রাজা

রামেশ্বর আত্মপ্রশস্তি কিছু না করে কেবলমাত্র কোন্ বছরে মন্দির নির্মিত হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যে সমস্ত কুশলী শিল্পীরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা অপরিজ্ঞাতই রয়েছেন।

রাজা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে এই রাজবংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রঘুদেব এবং গোবিন্দদেব। গোবিন্দদেব মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র নৃসিংহদেবের নাবালকত্বের সুযোগে বিস্তৃত জমিদারীর অনেকখানি জায়গা বর্ধমানের রাজা ও নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দখল করেন। গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহায্য করায় নৃসিংহ-দেব জমিদারী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১৯]

নৃসিংহদেবের যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। তিনি সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বাংলা ও ফারসিতে কবিতা রচনা করে গেছেন।[২০] ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর জন্য বাংলা মানচিত্র তৈরী করা, বাংলাতে 'উড্ডিস্-তন্ত্র' অনুবাদ করা এবং রাজা জয়-নারায়ণ ঘোষালের সঙ্গে যুক্তভাবে 'কাশী খণ্ডের' বাংলায় অনুবাদ নৃসিংহদেবের প্রতিভার পরিচায়ক।[২১] তিনি ১৭৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বয়ম্ভবা' মন্দির নির্মাণ করেন। তবে মন্দিরটি আকারে ছোট।[২২] ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য তিনি কাশীতে চলে যান। সেখানে তান্ত্রিকমতে যোগসাধনা ও সাহিত্যচর্চায় রত থাকেন।[২৩] এই অবস্থাতে তাঁর বাঁশবেড়িয়াস্থ ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর পেলেন যে জমিদারীর আয় থেকে অনেক টাকা জমেছে। এই টাকা দিয়ে নৃসিংহদেব যোগদর্শনের রূপটিকে মন্দিরের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। প্রায় দীর্ঘ আট বছর পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঁশ-বেড়িয়াতে ফিরে এলেন। কাশী থেকে চলে আসার সময় মন্দির নির্মাণের জন্য প্রখ্যাত শিল্পী, স্থপতি, রাজমিস্ত্রী এবং বড় বড় অনেক পাথর নিয়ে আসেন।[২৪] এই বছরই বাঁশবেড়িয়াতে হংসেশ্বরী মন্দিরের ভিত্ স্থাপন করেন। মন্দিরের গঠনরীতির সব পরিকল্পনা

তিনি নিজে করেন। যোগের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা পরা-শক্তির প্রকাশ হলেন দেবী হংসেশ্বরী। মানুষের দেহরূপ মন্দিরে যেমন ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্ন, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে ষট চক্রভেদের সহায়ক পাঁচটি নাড়ী আছে, তেমনি এই মন্দিরের পাঁচটি সিঁড়ি এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে কুলকুণ্ডলীরূপে দেবী হংসেশ্বরী বিরাজিত আছেন।[২৫] চিত ভাবে শয়ান শিবের নাভি থেকে একটি ডাঁটা উঠেছে, তার বৃন্তে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। দেবী হংসেশ্বরী সেই পদ্মফুলে বসে রয়েছেন। মূর্ত্তিটির গঠন কালীর মত হলেও, কালীর মত ভয়ঙ্করী নন। দেবীর মূর্তি নিম কাঠের তৈরী এবং নীল রং মাখানো। মন্দিরটি সাততলা। তেরটি গম্বুজ আছে। উচ্চতা প্রায় ৬০ ৭০ ফুট হবে।[২৬] প্রতিটি গম্বুজে একটি করে পাথরের শিব এবং নীচতলায় একটি শিব, অর্থাৎ সর্বমোট ১৪টি শিব প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে খোদাই সংস্কৃত শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে যে হংসেশ্বরী এই চতুর্দ্দশেশ্বর সহ বিরাজ করছেন, আর এ হলো মোক্ষলাভের নানা দরজা। নীচতলা থেকে উপরতলায় উঠবার সিঁড়ি রয়েছে। নীচতলায় একটি নাটমন্দিরও ছিল। এই মন্দিরের ছাদ কাশীর মন্দিরের গঠনরীতি অনুসারে করা হয়। সব মিলিয়ে মন্দিরটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মন্দিরের মধ্যে তান্ত্রিক যোগসাধনার এমন ভাস্কর্য-রূপ, আর মন্দিরের বিশেষ গঠনের জন্য হংসেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। পরবর্তীকালে এই মন্দিরে যেভাবে চুনকাম ইত্যাদি করা হয়েছে তাতে পূর্বের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকেনি। বর্ত্তমানে যদিও যথারীতি এই মন্দিরে পূজা অর্চনা চলছে। এখানকার তিনটি মন্দিরের মধ্যে হংসেশ্বরী মন্দিরই সবচেয়ে বড়।

এই হংসেশ্বরী মন্দিরের দ্বিতীয় তলা গাঁথা হবার পর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নৃসিংহদেব মারা যান। তারপর তাঁর পত্নী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ করেন মন্দির নির্মাণে মোট ব্যয় হয় প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। আর অনেক জাঁকজমক

করে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।[২৭]

বাসুদেব মন্দিরের যা অবস্থা তাতে যদি এখনই ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না হয় তবে মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাচীন আমলের বহু মন্দিরের মত বা স্থাপত্যকীর্তির মত কেবলমাত্র লেখক-দের বিবরণে নিদর্শন থাকবে। এখানে এসে প্রত্যেকটি দর্শকের একথা মনে হবে রাজবংশের স্থাপত্যকীর্তি দেখতে এসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, যে এই রাজবংশের পুরানো দলিল-দস্তাবেজ বিশেষ কিছুই নেই। এঁদের যে একটা মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল তারও কোন অস্তিত্ব নেই। এই পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তার কয়েকটা সংখ্যা দেখতে পেলাম। তাতে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু লেখকের নাম নেই। এই প্রবন্ধ এবং এই রাজবংশের মাসিক পত্রিকা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৯২।

২ ঐ

৩ ঐ

৪ সরসীকুমার সরস্বতী, পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা, vide পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ—পৃঃ ৭৪২।

৫ ঐ পৃঃ ৭৪১।

৬ ঐ পৃঃ ৭৪১।

৭ O. C. Ganguly and A. Goswami, Indian Terracotta Art, pp. 13, 15.

৮ Ibid, p. 15.

৯ Idid

১০ L. S. S. O' Malley and M. Chakrabarti, Bengal Distric Gazeetteers—Hooghly, p. 250.

১১ Ibid.

১২ Ibid.

১৩ Ibid.

১৪ Ibid, pp. 250-251.

১৫ S. C. Dey, The Bansberia Raj, pp. 21-22.

১৬ Ibid, p. 22.

১৭ Ibid, p. 23.

১৮ Ibid.

১৯ Bengal District Gazetteers-Hooghly, pp. 251-252.

২০ S. C. Dey—The Bansberia Raj, p. 45.

২১ Bengal District Gazetteers-Hooghly, p. 252.

২২ Ibid.

২৩ S. C. Dey, The Bansberia Raj, pp. 47-48.

২৪ Ibid, p. 49.

২৫ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, হুগলি ও হাওড়ার ইতিহাস, পৃঃ ২২৭-২২৮।

২৬ Bengal District Gazetteers-Hooghly, p. 254.

২৭ S. C. Dey—The Bansberia Raj, pp. 49-52.

কোণারকের সূর্যমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ

কোণারকের সূর্যমন্দির ভারতীয় স্থাপত্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। পুরী থেকে ২০।২১ মাইল উত্তরপূর্বে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির থেকে সমুদ্রের দূরত্ব দেড় মাইল। অতীতে নাবিকদের কাছে পুরী ও কোণারকের মন্দির ছিল নিশানাস্বরূপ। এ দুটো দেখে তারা বুঝতে পারতো যে তারা উড়িষ্যার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। কোণারকের মন্দিরকে তারা বলতো 'ব্ল্যাক প্যাগোডা', আর পুরীর মন্দিরকে 'হোয়াইট প্যাগোডা'। সূর্যমূর্তি পূজার এই পবিত্র স্থান সম্পর্কে 'পুরাণে'-ও উল্লেখ রয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কঠোর সাধনায় রত ছিলেন ও রোগমুক্ত হন।[১] বৈদিকযুগ থেকে ভারতবর্ষে সূর্যপূজার প্রচলন থাকলেও সূর্যমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পারস্যদেশ থেকে একদল পুরোহিত ভারতবর্ষে আসেন এবং তাঁরাই পূজার প্রবর্তন করেন। কালক্রমে সূর্যমূর্তি পূজা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যপূজার ক্ষেত্র তৈরী হয়, যেমন, কোণারক, মুলতান ইত্যাদি অঞ্চলের সূর্যমন্দির। তবে পরবর্তীকালে সূর্যমূর্তি পূজার প্রভাব কখন থেকে কমে যায় সে সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যাদি নেই।[২]

উড়িষ্যার গংগাবংশের বৈষ্ণব রাজাদের আমল বিশেষ বিখ্যাত। এই বংশের রাজা প্রথম নরসিংহদেব (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) কোণারকের সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোণারকের মন্দির তৈরী হয়। 'কোণাকোণ' শহরে এই মন্দির নির্মিত হয়। আধুনিক কোণারক নামের উদ্ভব ঘটে 'Kona' (corner) এবং 'Arka' (Sun-god) শব্দ থেকে।[৩]

এক সময়ে এখানে একটি বিস্তৃত ও সমৃদ্ধশালী শহর ছিল।

আর এখানে একটি বন্দরও ছিল। এই বন্দরের নাম ছিল 'Charitra Bandara'।[8] স্থানীয় কিংবদন্তী থেকে জানতে পারা যায় যে, এই মন্দির নির্মাণ করতে ১৬ বছর লাগে। এই মন্দির নির্মাণে কত ব্যয় হয় সে সম্পর্কে 'আইন্ ই-আকবরী' গ্রন্থে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'Its cost was defrayed by twelve years' revenue of the province.'[5] উড়িষ্যার বাৎসরিক আয় ছিল তখন তিন কোটি টাকা বা ২০ লক্ষ পাউণ্ড।[6] গোড়াতে এই মন্দিরের উচ্চতা ছিল ২২৭ ফুট। মন্দিরটি রথের আকারে পরিকল্পিত। রথের বারো জোড়া চাকা, আর সাতটি অশ্ব এই রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রধান 'রথ দেউল' (যেখানে বিগ্রহ থাকে। 'রেখ দেউল-এর অপর নাম 'বড় দেউল') ভাঙ্গা পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু 'জগমোহন' (যাত্রীরা যেখানে দাঁড়িয়ে বিগ্রহকে দর্শন করেন) মোটের ওপর আস্ত আছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ও পুরীর মন্দির-এর চেয়ে কোণারকের মন্দিরের উচ্চতা অনেক বেশী। কিন্তু এ দুটো মন্দিরই কোণারকের চেয়ে অনেক পূর্বে নির্মিত হয়েছে। অথচ ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দির এখনও অটুট দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কোণারকের মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসের কারণ নিয়ে বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তবুও এ প্রশ্ন এখনও গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে।

কখন মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়েছে তা সুনিদিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতে দেখতে পাওয়া যায়।[7] মন্দিব ধ্বংসের কারণ হিসাবে প্রধানতঃ যে বক্তব্যগুলো আমরা পাই তা হচ্ছে নিম্নরূপ :—

(১) মিঃ ফারগাসন-এর মতে ভিত বসে যাওয়ার ফলে মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ে[8] মিঃ হাণ্টারও এই মতের সমর্থক। তবে এই বক্তব্যের সঙ্গে হাণ্টার আরও একটু সংযোজিত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"The great temple alone survives and even it seems never to have been completed, on the foundation of the internal pillars on which the heavy dome rested gave way before the outer halls were finished"[৯] প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই মতবাদ পোষণ করতেন [১০]

(২) মিঃ স্টার্লিং ভূকম্পন ও বজ্রপাতকে মন্দির ধ্বংসের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১১]

(৩) পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এম. এইচ. আর্ণট-এর উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তিনি লিখেছেন: "It is nearly certain that the Dewl fell from the same cause, viz. that when the sand was removed from interior, weight above was not great enough to resist the tendency of the corbilling to fall in. The heap of stones is direct proof that the result of the catastrophe, when it did take place, hurled stones inwards and not outwards; had it been the latter, the heap would have been a scattered one instead of which it is a remarkably compact one."[১২] মিঃ আর্ণটের মতে বালির স্তূপের উপর এই মন্দির তৈরী করা হয়েছিল এবং মন্দির তৈরী করার পর যখন বালুকারাশি মন্দিরের দরজা দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়, তখন মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং তৈরী করবার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আর্ণট আরো উল্লেখ করেছেন যে মন্দিরটি তৈরী করবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবার ফলে সূর্যমূর্তি পূজার কাজে মন্দিরটি কখনই ব্যবহৃত হয়নি।

(৪) বিষণস্বরূপ, কৃপাসিন্ধু মিশ্র ও মনোমোহন গাঙ্গুলি বলছেন যে ষোড়শ শতকে কালাপাহাড় কোণারক মন্দির আক্রমণ করে

ক্ষতিসাধন করে। এর ফলে সূর্যমূর্তিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয় (বলা হয় যে কোণারকের সূর্যমূর্তি পুরী জগন্নাথের মন্দিরে আছে) এবং মন্দির পরিত্যক্ত হয়। এরপর থেকেই ক্রমশঃ মন্দির ভেঙ্গে যেতে থাকে।[১৩]

এবার বক্তব্যগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। প্রথমোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। উড়িষ্যাতে স্থাপত্য শিল্প খুবই উৎকর্ষতা লাভ করে। কাজেই সহজে একথা মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয় যে কুশলী শিল্পীরা ও মন্দির নির্মাতারা কোণারক মন্দিরের ভিত সুদৃঢ় করে গড়ে তোলেননি অথবা ত্রুটিযুক্ত জমিতে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মনোমোহন গাঙ্গুলি মহাশয় লিখেছেন : "I examined the temple very carefully and did not notice anywhere the least trace of the subsidence of the soil. This would have, as a matter of course, occasioned vertical cracks in the structure and horizontal one in the floor of the sanctum ; the floor, I have noticed, is without any crack ; moreover, the collapse due to the subsidence of the soil would have tumbled down the temple on one side which did not occur actually."[১৪]

দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে উড়িষ্যাতে প্রচণ্ডভাবে ভূকম্পন কখনই অনুভূত হয়নি। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে কোণারকে ভূকম্পন হয়েছিল, তাহলে এ ঘটনার ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায় যে, কেন কেবলমাত্র 'বিমান' বা প্রধান মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, আর 'জগমোহন'-এর কিছু হল না কেন? তাছাড়া বজ্রপাত থেকে মন্দির রক্ষা করার পদ্ধতি সম্পর্কে মন্দির নির্মাতারা যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ভারতের স্থাপত্যরীতি বিষয়ক তথ্যাদিতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ

রয়েছে।[১৫]

আর্ণট যে তথ্য দিয়েছেন তাও গ্রহণ করা কষ্টকর। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের বিবরণ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মন্দিরটি ভাল অবস্থাতেই ছিল।[১৬] আবুল ফজলের বর্ণনায় চাকার উল্লেখ নেই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের ধারণা যে, চাকাগুলো তখন বালিচাপা পড়েছিল।[১৭] ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ স্টার্লিং যখন কোণারক মন্দির পরিদর্শনে আসেন,[১৮] তখনও মন্দিরের উচ্চতা ১২০ ফুট ছিল।[১৯] ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ফারগাসন যখন কোণারকে যান তখনও 'বিমানে'র উচ্চতা ১২০ ফুট ছিল।[২০] কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ডঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র কোণারকে যান তখন মন্দিরটি একেবারেই ভেঙ্গে যায়।[২১] সুতরাং বালুকারাশি সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এ উক্তি সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে না। অন্যদিকে এও দেখতে পাওয়া যায় যে সূর্যমূর্তি স্থাপনা করা হয়েছিল এবং যথারীতি পূজাও হত।[২২] বিষণস্বরূপ তাঁর Konarka পুস্তকে কোণারক মন্দিরে পূজার উল্লেখ করেছেন।[২৩]

চতুর্থ বক্তব্য সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, কালাপাহাড় কোণারক মন্দির আক্রমণ করে যে ক্ষতিসাধন করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[২৪] তবে এ আক্রমণের ফলে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। বলা হয় যে, কালাপাহাড় মন্দিরটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে না পেরে বড় দেউলের উপর থেকে 'পিতলের কলস' ভেঙ্গে ফেলে। কলসটি একটি লোহার কাঠি দিয়ে রাখা হয়েছিল। একে চুম্বক লোহা বলা হয়েছে জনপ্রবাদ এই যে, চুম্বক কাঠি সরিয়ে ফেলার জন্য মন্দিরটি ভেঙ্গে যায় ও পরিত্যক্ত হয়। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এই জনপ্রবাদ মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। আর ভেঙ্গে যাবার ফলে মন্দির পরিত্যক্ত হয়, এ তথ্যও অনেকে মানতে রাজী নন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের অভিমত এই যে,

মুসলমানের অত্যাচারে মন্দির পরিত্যক্ত হয়। তারপর মন্দির ক্রমশ ভেঙ্গে যায়।[২৫] ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে (১৫৩৩) মুসলমানদের অত্যাচারে কোণারক মন্দির পরিত্যক্ত হয়। অধ্যাপক বসু প্রশ্ন করেছেন যে, মন্দির ভেঙ্গে যাচ্ছে অথচ কেন মেরামত করা হয়নি? তাছাড়া মুসলমানেরা তো সেখানে সব সময় ওৎ পেতে বসে থাকেনি। অধ্যাপক বসুর মতে কোণারক শহরের প্রসার তখন কমে এসেছে ও শহরটি লোপ পেতে বসেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই এই অঞ্চলে ধ্বংসের লীলা শুরু হয় আর তাই কোণারকের ভগ্ন মন্দির মেরামতের এবং নূতন দেবমূর্তি স্থাপনের জন্য "সম্মিলিত চেষ্টার" অভাব ঘটে।[২৬]

১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা উড়িষ্যা আক্রমণ করে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা মারাঠা শাসনাধীন ছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কোণারক মন্দিরের চারিপাশে যে দেওয়াল ছিল বর্তমানে তারও অস্তিত্ব নেই। মারাঠারা এখান থেকে পাথর সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুরীতে বিভিন্ন মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করে।[২৭] যাই হোক, মারাঠা শাসনের সঙ্গে কোণারক মন্দির ধ্বংসের কারণের কোন যোগসূত্র নেই।

উপরে মন্দির ধ্বংসের যে চারটি কারণ সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করলাম তা কেউ কেউ মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে কোণারক মন্দির আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিদেশীদের দ্বারা।[২৮] ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতব, তাঁর Orissa Itihasa-এ এই বক্তব্যের স্বপক্ষে আলোচনা করেছেন। ফিরিঙ্গীরা এখানকার সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতের সময় কোণারক মন্দিরের দিকে সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সময়ে এই ফিরিঙ্গীরা মন্দির আক্রমণ করে এবং পাথর সরিয়ে নিয়ে যায়। এ দেশীয়রা তখন পর্তুগীজদের ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত করত। ষোড়শ শতকে ভারতে পর্তুগীজদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা

ব্যর্থ হলেও, বাংলা ও উড়িষ্যাতে তখনও পর্তুগীজরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। উড়িষ্যার পিপলী বন্দর এদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ভারতে পর্তুগীজরা কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যেই অংশ গ্রহণ করত না, জোর-জবরদস্তি করে ভারতীয়দের এরা ধর্মান্তকরণ করাত। তাছাড়া যেখানে তাদের প্রাধান্য ছিল সেখানে তারা হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করত, এমন নজির পাওয়া যায়। যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে উড়িষ্যাতে একটানা দীর্ঘ দিন ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল, যেমন ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগানদের শাসন ও তারপর মুঘল শাসন ইত্যাদি। আর খুরদার রাজাও পলাতক। ফলে পর্তুগীজদের কোণারক মন্দির ধ্বংস করতে সুবিধাই হয়। কারণ তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। পুরীর গজপতি মহারাজের দলিল-দস্তাবেজের মধ্য থেকে একটি মূল্যবান দলিল পাওয়া গেছে।[২৯] তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে পিপলির আল্‌বুকার্ক ভিত্তো নামক একজন পর্তুগীজ যখন খুরদার রাজার অবর্তমানে কোণারক মন্দির ধ্বংস করছিল তখন মধুসূদন মহাপাত্র এবং বীর সামর্থ আল্‌বুকার্ক ভিত্তোকে বাধা দেয়। সেজন্য মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে জালাওয়ার খান্ নাজিম (সম্ভবতঃ উড়িষ্যার তৎকালীন সুবাদার) এ দুজনকে পুরস্কৃত করেন।[৩০] কিন্তু পিপলির এই আল্‌বুকার্ক ভিত্তো সম্পর্কে এখনও সবিস্তারে কিছু জানা যায় না।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট খনন কার্য্য করে বালির স্তূপ থেকে মন্দিরটিকে উদ্ধার করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে কোণারক মন্দিরের যে জগমোহন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে বালি-পাথর প্রভৃতি ভরে দিয়ে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আর এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও যতটুকু টিকে রয়েছে তা এখনও দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

সূত্র নির্দেশ

১ Monomohan Ganguly, Orissa and Her Remains—Ancient and Mediaeval (District Puri), pp. 439-440.

২ নির্মলকুমার বসু, কণারকের বিবরণ, পৃঃ ১-৩। অধ্যাপক বসুর মতে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলেই সূর্যমূর্তি পূজার প্রভাব কমতে থাকে।

৩ M. Ganguly, Orissa and Her Remains, p. 437.

৪ Proceeding of the Indian History Congress, Fifteenth Session 1952, p. 229.

৫ Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Translated by Jarrett, Vol. II, p. 128.

৬ M. Ganguli, Orissa and Her Remains, p. 483.

৭ L. S. S. O' Malley, Bengal District Gazetteers, Puri, p. 279.

৮ Proceedings of the Indians History Congress, 1952, p. 229.

৯ W. W. Hunter, Orissa, Vol-I, p. 289.

১০ Ibid, p. 289.

১১ Proceedings of the Indian History Congress, 1952, p. 229.

১২ L S. S. O'Malley, District Gazetteers, Puri, p. 279.

১৩ Proceedings of the Indian History Congress, 1952, p. 229.

১৪ M. Ganguly, Orissa and Her Remains, p. 455.

১৫ Proceedings of the Indian History Congress, 1952, p. 230.

১৬ M. Ganguly, Orissa and Her Remains, p. 454.

১৭ নির্মলকুমার বসু কণারকের বিবরণ, পৃঃ ৫।

১৮ M Ganguli, Orissa and Her Remains, p. 441.

১৯ L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Puri, p. 280.

২০ James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, p. 426.

২১ L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Puri, p. 280.

২২ নির্মলকুমার বসু, কণারকের বিবরণ, ৪-৫, ১২৬। Vide also Proceedings of the Indian History Congress, p. 230.

২৩ M. Ganguly, Orissa and Her Remains, P. 451-455.

২৪ Hare Krishna Mahtab, The History of Orissa, p. 96.

২৫ নির্মলকুমার বসু, কণারকের বিবরণ, পৃঃ ৭।

২৬ Ibid, পৃ: ৭।

২৭ W. W. Hunter, Orissa, Vol. I. p. 291.

২৮ Proceedings of the Indian History Congress, 1952, p. 231.

২৯ Ibid, p. 231.

৩০ Ibid, p. 231.

বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের অবদান

কলকাতা শহর হতে ত্রিশ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদার বংশে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ ও মাতা ক্ষিরোদমোহিনী। এই দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকেতু দত্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (মুন্সী) ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তিনি দক্ষিণ দিকে চলে এসে গঙ্গা নদীর তীরে একটি নতুন গ্রামের পত্তন করেন। পরে এই গ্রামের নামকরণ হয় মজিলপুর। কালিদাস দত্তের মাতা ছিলেন বারাসত মহাকুমা শহরের বিখ্যাত 'মিত্র' বংশের কন্যা। তাঁর মাতামহ রাজকৃষ্ণ মিত্র বিদ্যাচর্চা, সমাজ সেবা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মজিলপুরের নিকটবর্তী বহড়ু পল্লীর ইংরেজী বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কালিদাস দত্ত আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররূপে যোগ দেননি। তবে কৈশোর কাল থেকেই তিনি অসাধারণ পাঠানুরাগী ছিলেন এবং নিজের বাড়ীতে একটি পাঠাগার ও পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। এই পাঠাগারে তিনি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ বিশেষ করে ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। গভীর অনুসন্ধানী মন নিয়ে তিনি ইতিহাস চর্চা সুরু করেন। একান্তই নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি সংস্কৃত, পালি ও ইংরেজি ভাষায় বুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রখ্যাত লেখকদের রচনা পাঠ করেন। প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে কালিদাস দত্তের পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর রচনাবলী পাঠ করলেই বোঝা যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকে ১৯৬৭

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি একটানা কঠোর পরিশ্রম করে এবং স্বীয় প্রতিভার দ্বারা নিম্ন বঙ্গের বিশেষভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন ও লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস উদ্ধার করেন। এই অঞ্চল হিংস্র পশু ও বিষধর সর্পের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু এইসব কিছু অগ্রাহ্য করে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য কালিদাস দত্ত দিনের পর দিন নৌকায় বাস করেন, অথবা কখনও পদব্রজে সুন্দরবনের মহাদুর্গম পথ অতিক্রম করেন। নিম্ন বঙ্গের প্রায় প্রতিটি স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে তিনি অনেক দুর্লভ পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে কারও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তিনিই প্রথম এখানকার অন্ধকারময় ইতিহাস আবিষ্কারে উদ্যোগী হন।[২]

নিম্নবঙ্গের প্রাচীন ও লুপ্ত সভ্যতার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচনা করেন। এই সব গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফ ; 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টালি, 'সাইন্স এণ্ড কালচার' ; 'মডার্ণ রিভিউ', 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী,' 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' এবং চব্বিশ পরগণা জেলা হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফে' নিম্নবঙ্গে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমুহ সবিশেষ বর্ণনা করেন।[৩] অষ্টাদশ শতকের শেষে সুন্দরবন অঞ্চলে (বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে নিম্ন অঞ্চলে) চাষ-বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গ্রামের পত্তন হয়। এখানে বেশীরভাগ অধিবাসী ছিলেন কৃষিজীবী। আর চারদিকে ছিল বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। এই গ্রামগুলি ও ধানের ক্ষেত রক্ষার জন্য বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই অঞ্চলে চাষবাসের সূচনা ও বসতি স্থাপনের ফলে পুকুর, খাল, নালা কাটতে গিয়ে বহু সংখ্যক প্রাচীন দালান ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, পাথর ও ধাতুর তৈরী হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ দেব-

দেবীর মূর্তি, শিলালিপি ও মুদ্রা পাওয়া যায়।[৪] কালিদাস দত্ত যে সমস্ত পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন তারমধ্যে একহাজার বছরের প্রাচীন-আদি-মধ্য যুগীয় প্রস্তর ভাস্কর্য ও ব্রোঞ্জদ্রব্য, নব্য প্রস্তর যুগীয় হাতিয়ার, পোড়ামাটির তৈরী মূর্তি ও মৃৎপাত্র, কাঠের খোদাই কার্য, নানারূপ মুদ্রা, অঙ্কণশিল্প, ঐতিহাসিক দলিল, প্রাচীন পুঁথি ও মানচিত্র রয়েছে। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার হরিণারায়ণপুরে (ডায়মণ্ডহারবারের চারমাইল দক্ষিণে কুলপী থানার অন্তর্ভুক্ত) বড় ও সুন্দর ফুলদানি পেয়েছেন। এর গড়ন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও প্রাচীন রোমে প্রাপ্ত ফুলদানির মত।[৫] এইসব সংগ্রহের মধ্যে এমন সব জিনিষপত্র রয়েছে যার সাহায্যে আদিম এবং মৌর্য গুপ্ত-কুষাণ-পাল-সেন যুগের বাংলার অতীত ইতিহাস জানা যায়। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১০৭৮ হিজরি সনের আওরঙ্গজেবের একটি মূল্যবান সনদও রয়েছে। কালিদাস দত্ত এই সনদের যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তা নিম্নরূপ: "It purports to be renewal of a previous Sanad by which 26 bighas of land in Pargana Muragacha were conferred as a Brahmottar on Ratneswar Chakravarti." তাছাড়া তিনি রেনেল সম্পাদিত দুর্লভ মানচিত্র, দুহাজার মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেন।

এই সব প্রাচীন নিদর্শনের সাহায্যে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিম যুগেও নিম্নবঙ্গে মনুষ্য বসতি ছিল এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পাঁচটি পোড়ামাটির তৈরী মূর্তি, দশটি প্রস্তরের হাতিয়ার এবং আটটি হাড় দিয়ে প্রস্তুত সূক্ষ্মাগ্র কাঁটা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধরণের নিদর্শন নিম্নবঙ্গে এই প্রথম পাওয়া গেল। কিন্তু এইসব যারা নির্মাণ করেছে তাদের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে আজও আলোকপাত করা যায়নি। হরিনারায়ণপুরে খননকার্য চালালে হয়তো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।[৬] আরও কিছু দুর্লভ

পুরাবস্তু সংগ্রহের পর তিনি বলেন : "The discovery of these antiquities now undoubtedly establishes the fact that this part of lower Bengal is not a newly-born region and human settlements existed here from remote times."[৭]

পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল, সেন রাজাদের আমলে এখানে বহু জনপদ গড়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন জনপদ, প্রাচীন মন্দির, আঞ্চলিক দেবতা ও লোকগাথা নিয়েও বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। পালযুগে (৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) 'জটার দেউল' নামে একটি সুন্দর উত্তুঙ্গ মন্দির মথুরাপুর থানার অধীনে ১১৬ নম্বর লাটে (মনিনদীর নিকটে) নির্মিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। ইতিপূর্বে হিংস্র জন্তুর বিচরণস্থল গভীর অরণ্যে অবস্থিত মন্দিরটির কথা কেউ জানত না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত ভাষার তাম্রলিপি হতে জানা যায় যে, রাজা জয়ন্ত চন্দ্র 'জটার দেউল' নির্মাণ করেন। কিন্তু পরে এই লিপিখানি হারিয়ে যায়। এই মন্দিরটি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি, তাই কালিদাস দত্ত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সমালোচনা করেন। তাঁর ধারণা এটি একটি শিবের মন্দির ছিল। তিনি এখানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে সব মুদ্রা সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ৩টি মুদ্রা ছিল কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত। কিন্তু কোন লিপি না থাকায় তাহা কোন্ রাজার আমলে চালু করা হয় তা বলা যায়নি। 'জটার দেউল' এর নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কে কালিদাস দত্ত বলেন "কুষাণ যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের নৃপতিগণ সম্রাটদের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্মাণ করাইতেন। উড়িষ্যাতে পুরী ও গঞ্জাম জেলায় ঐ জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত। জটার দেউলের পূর্বোক্ত

মুদ্রাগুলি কুষাণ যুগে দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত উল্লিখিতরূপ মুদ্রা হওয়া অসম্ভব নহে।"[৮] জটার দেউলের কাছে ভূগর্ভ খনন কালে একটি কালো পাথরের বড় বিষ্ণু মূর্তির দেহের ভগ্নাংশ কালিদাস দত্ত পান। বর্তমানে সেটি আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে। কালিদাস দত্তের মতে এই মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর হবে [৯] জটার দেউলের পশ্চিম দিকে কঙ্কনদীঘিতে যে কয়েকটি প্রাচীন ইটের স্তূপ ও অনেক পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তার সঙ্গে জটার দেউলে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের সাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয় এখানে জনপদ একই সময়ে গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে খননকার্যের প্রয়োজনীয়তা কালিদাস দত্ত উল্লেখ করেন [১০]

একটি প্রবন্ধে তিনি এই অঞ্চলে প্রাপ্ত দুটো প্রস্তর ভাস্কর্য-সূর্য ও নবগ্রহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। সূর্য মূর্তিটি জয়নগর থানার অন্তর্ভুক্ত কাশীপুর গ্রামে পুকুর কাটার সময় পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি গুপ্ত যুগের শেষের দিকের হবে এবং বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়ামে আছে। ঠিক এই ধরণের মূর্তি আর একটি মাত্র বাংলা দেশের বগুড়া জেলায় পাওয়া যায়। আর নবগ্রহ ফলকটি মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কঙ্কনদীঘির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়।[১১]

দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত খাড়ী নামক একটি প্রাচীন গ্রাম নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। প্রাচীন-কালে আদি গঙ্গানদী এই গ্রামের পশ্চিমসীমা দিয়ে প্রবাহিত হত এবং এটি ছিল নিম্নবঙ্গের পশ্চিমাংশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।[১২] খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত ডাকর্ণব নামক একখানি পুঁথিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা চৌষট্টি পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীঠস্থানরূপে এই গ্রামকে মনে করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা লক্ষণ সেনের আমলে একখানি তাম্রশাসন খাড়ীর নিকটবর্তী বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটার সময় পাওয়া যায়।

এই তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে যে. বাংলাদেশে সেনরাজাদের শাসন-কালে (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) তৎকালীন শাসন বিভাগ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে খাড়ী মণ্ডলের সদর স্থান ছিল। মহারাজা লক্ষণ সেন ব্যাসদেব শর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে মণ্ডল গ্রামে যে ভূমিদান করেন তা এর অন্তর্গত ছিল. হিন্দু রাজারা শাসনের সুবিধার জন্য বাংলা দেশকে 'ভুক্তি' নামক কয়েকটি বড় বিভাগ এবং 'ভুক্তির' অধীনে 'মণ্ডল' নামক কয়েকটি ছোট বিভাগে ভাগ করেন। ভুক্তির শাসনকর্তাকে 'ভুক্তিশ্বর' ও মণ্ডলের শাসনকর্তাকে 'মণ্ডলেশ্বর' বা 'মণ্ডলাধিপ' বলা হত। এঁরা রাজার অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এক একটি মণ্ডলের আয়তন বিশাল ছিল। এর সুশাসনের প্রয়োজনে মণ্ডলেশ্বরের কোষ, দণ্ড, অমাত্য ও দুর্গের ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত পশ্চিম সুন্দরবন খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল [১৩] এখানে কালিদাস দত্ত কয়েকটি মজা পুকুর ও গড় আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া তিনি অনেক পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি এবং চারটি খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কালো পাথরের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরের window frame আছে। বর্তমানে এখানে যদুনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর একটি কালো পাথরের তিন ফিট উচ্চ বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হচ্ছে। পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও এখানে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং ৩০ ৪০ ফিট উচ্চ বাঁধ দ্বারা ঘেরা দুটো বড় পুকুরের বুজিয়ে যাওয়া স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কলিদাস দত্ত মনে করেন যে, এগুলো খাড়ী মণ্ডলেরই 'প্রাচীন গ্রাম নগরাদির নিদর্শন'।[১৪]

মুসলমান আমলের কিছু উপকরণও খাড়ীতে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে এখানে কয়েকজন পীরের আগমন হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্ম প্রচার ও বিস্তার করা।

বড়খাঁ গাজী ছিলেন এমনি একজন বিখ্যাত পীর এবং খাড়ীতে তাঁর আস্তানা ছিল। তিনি চব্বিশ পরগণার বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। বড়খাঁ গাজীর কার্যকলাপ ও শক্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এখনও তাঁর সম্পর্কে নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকসঙ্গীত শোনা যায়। এই সময়ে দক্ষিণ রায় নামক একজন শক্তিশালী ব্যক্তি অরাজকতায় উৎপীড়িত হিন্দুদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ করা যাতে সম্ভব না হয়, সেজন্য তিনি প্রবলভাবে বড়খাঁ গাজীকে বাধা দেন। ফলে এঁদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হত। বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের বিরোধের খবর রায় মঙ্গলে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দক্ষিণ রায়ও খাড়ীতে এসে থাকতেন। কালিদাস দত্ত বলেন: "উক্ত দক্ষিণ রায়ই তাঁহার অসাধারণ শক্তি, পরহিতৈষণা এবং সধর্ম ও স্বজাতি প্রীতির নিমিত্ত পরে হিন্দুদের দেবতায় পরিণত হন। আজিও নিম্ন-বঙ্গের নানাস্থানে তাঁহার যোদ্ধাবেশী মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে তাঁহার ঐরূপ যে সমস্ত মূর্তি আছে তন্মধ্যে বারুইপুর থানার অধীন ধপধাপি গ্রামের মূর্তিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।[১৫]

'খাড়ি মণ্ডল' নামক আর একটি প্রবন্ধেও (ভারতবর্ষ, বাংলা ১৩৩৩ সন) কালিদাস দত্ত এই গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেন আমলের পরে খাড়ী মণ্ডলের যে অংশে লোকালয় ছিল তা নিয়ে মুসলমান আমলে খাড়ী পরগণা গঠন করা হয়। আইন-ই-আকবরীতেও খাড়ীর উল্লেখ আছে। বর্তমান সময়ে খাড়ীতে যে লোকালয় দেখা যায় তার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তবে পূর্বে এই অঞ্চল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।[১৬]

চব্বিশ পরগণা জেলার আরও দুটো পুরাতন গ্রাম সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসত সম্পর্কেও তিনি অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেন।[১৭] সরিষাদহ গ্রামটি জয়নগর থানার মধ্যে অবস্থিত। অনেককাল আগে এই গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হত। তখন

এখানে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু পরে ভাগীরথীর প্রবাহ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এর শুষ্ক গর্ভ 'গঙ্গার বাদা' নামে এক বিস্তৃত নিম্ন-ভূমিতে পরিণত হয়। সরিষাদহের পশ্চিমে এখনও এই 'গঙ্গার বাদা' রয়েছে। সম্প্রতি এর দক্ষিণে গঙ্গার বাদার নিকটে মাটি কাটার সময় কালো পাথরের নির্মিত একটি প্রায় চার ফিট উচ্চ সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি ও একটি কারুকার্য খোদিত প্রায় ১০ ফিট উচ্চ কালো প্রস্তর স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর কাছে কালো পাথরের সুন্দর নৃসিংহ মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখানে প্রায় সাড়ে তিন ফিট উচ্চ কালো পাথরের পেনেট সহ শিবলিঙ্গও পাওয়া যায়। এই শিবলিঙ্গ এখন একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে সরিষাদহের হিন্দুদের আরাধ্য দেবতারূপে বিরাজ করছেন। এই অঞ্চলের নিকটে 'কাজীরডাঙ্গা' নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই ধরণের মূর্তি অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এখানকার পুরাবস্তুসমূহের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেন: "এই কাজীর ডাঙ্গা নামক স্থানটি বহুসংখ্যক প্রাচীন ইষ্টক সমাকীর্ণ। আমার বোধ হয়, এই স্থান খনন করিলে এখনও বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে ইহার উপর কয়েকটি মুসলমানের কবর আছে বলিয়াই লোকে এখনও স্থানটি খনন করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরিউক্ত নিদর্শনগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গাতীরস্থ এই সকল স্থানে বিষ্ণু মন্দিরের সংখ্যাই অধিক ছিল। এই মূর্তিগুলি কতদিনের প্রাচীন তাহা জানা যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাল ও সেন রাজাগণের সময়েই বঙ্গদেশে ঐরূপ সুন্দর দেবমূর্তি নির্মিত হইত"।[১৮]

সরিষাদহ গ্রামের পশ্চিমদিকে রয়েছে দক্ষিণ বারাসত গ্রাম প্রবাদ আছে, পুরাকালে উজানি নগরের বিখ্যাত বণিক ধনপতি দত্তের পুত্র শ্রীমন্ত ভাগীরথীর পথে সিংহলে যাবার সময় এখানে এসে 'শতবারা'র (বারা ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নাম) পুজা করেন

বলে এই অঞ্চলের নাম বারাসত হয়েছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দ-রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যেও এই স্থানের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ বারাসতে আদি মহেশ্বর নামক একটি পুরাতন মন্দিরে লিঙ্গমূর্তি আছে। বকুলতলায় ও বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের যে দুটো তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তাতে জানা যায়, "প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্বোক্ত সরিষাদহ প্রভৃতি স্থান প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী মণ্ডলের ও পশ্চিমতীরস্থ এই দক্ষিণ বারাসত প্রভৃতি গ্রাম পুরাতন বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল"।[১৯] কালিদাস দত্ত 'আদি গঙ্গা-তীরস্থ সুন্দরবনের কথা' নামক প্রবন্ধে এ দুটো তাম্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, মুসলমান আমলে এসব জায়গা সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত ছিল। পরে এই অঞ্চল বারিদহাটী ও ময়দা পরগণার মধ্যে ছিল।[২০]

তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে জয়নগর গ্রামের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন।[২১] এই গ্রামের পূর্ব সীমায় ছিল আদিগঙ্গা নদী। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত রায় মঙ্গল কাব্যে সর্ব প্রথম এই অঞ্চলের নাম 'জয়নগর' বলা হয়েছে। অনেকের মতে এখানকার আরাধ্যা দেবী জয়চণ্ডী থেকে জয়নগর নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 'দেশাবলী বিবৃত্তি' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানকার একজন পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরাজিত করায় রাজা এই স্থানের নাম জয়নগর দেন। অবশ্য কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।[২২] জয়-নগরে হিন্দুদের যে সমস্ত দেবদেবী রয়েছে তার মধ্যে শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী ও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলাল বংশের পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল তিনশত বৎসর পূর্বে এখানে শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এখানে বসবাস শুরু করেন। এখানকার আর একটি প্রাচীন বংশ হল মিত্র বংশ। এই বংশের পূর্ব পুরুষ রাম-

গোপাল মিত্র কবে থেকে এখানে বসবাস শুরু করেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর বংশধরেরা এখানে অষ্টাদশটি দেবমন্দির, অনেক অট্টালিকা ও ঘাট নির্মাণ করেন। সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরিভাগে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে তা থেকে জানা যায় রামগোপাল মিত্রের পৌত্র কামদেব মিত্র কর্তৃক ১৬৮৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তথ্য থেকে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রামগোপাল মিত্র এখানে বসতি স্থাপন করেন। এই মিত্র বংশের দ্বারা স্থাপিত দু তিনটি মন্দির নানারূপ কারুকার্য মণ্ডিত ইষ্টক দ্বারা শোভিত ছিল এবং তাতে অনেকগুলি মিথুন মূর্তিও ছিল। পরে এগুলো কেউ নষ্ট করে ফেলে পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে তার উল্লেখ আছে[২৩] শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের দারুময় যুগল মূর্তি উচ্চতায় প্রায় চার ফিট। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে এই মূর্তি দুটো খাড়ীতে ছিল এবং খাড়ীর প্রাচীন জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর অরণ্যাবৃত হওয়ায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রাজা প্রতাপাদিত্য এই মূর্তি দুটো ওখান থেকে নিয়ে এসে জয়নগরে স্থাপন করেন। বর্তমানে যে মন্দিরে এই যুগল মূর্তি আছে তা দেড়শত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ বারাসতের চৌধুরী বংশ কর্তৃক নির্মিত হয়। তার পূর্বে এই মূর্তি অন্য একটি মন্দিরে ছিল।[২৪]

তাছাড়া জয়নগরের রক্তাখাঁ নামক জায়গায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ওলাবিবি নামক একটি প্রাচীন লৌকিক দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মাটির ঢিবিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। এঁর কোন মূর্তি নেই। বর্তমানে এই দেবতা ইষ্টক নির্মিত গৃহের মধ্যে আছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই দেবতা তুষ্ট থাকলে ওলাউঠা (কলেরা) রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ওলাবিবির পূজা করেন। অনেক লোক এক সঙ্গে নানারূপে ফল মিষ্টান্ন ও এই দেবতার 'ছলন' নামে একটি ছোট

মূর্তি মাটির ঢিবির কাছে রেখে দেয়। তখন মুসলমান পুরোহিত এই সব জিনিষ ওলাবিবিকে উৎসর্গ করে দেন। প্রবাদ আছে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রক্তাখাঁ স্থানটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। তবে রক্তাখাঁ নামের উৎপত্তি এখনও অজ্ঞাত। কালিদাস দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, মুসলমান আমলে প্রচলিত গাজীর গানের মধ্যে রক্তাখাঁ গাজী নামে বিখ্যাত একজন গাজীর গানও ছিল। এই রক্তাখাঁ গাজীর গানের পুঁথি নিমপীঠ-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র গায়েনের কাছে পাওয়া যায়। তাই এখানে হয়তো রক্তাখাঁ গাজীর আস্তানা ছিল। এখনও ওলাবিবির গান লোকগাথারূপে প্রচলিত আছে। মুসলমান আমলে একশ্রেণীর লোক আঞ্চলিক দেবতা ও গাজী নামে অভিহিত পীরের নামে গান রচনা করে গেয়ে বেড়াত। এই ভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এখনও তাদের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এই বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তেমনি সুন্দর-বনের দেবতা বনবিবিকে নিয়েও লোকগাথা শুনতে পাওয়া যায়। এই সব লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ না করার জন্য কালিদাস দত্ত দুঃখ প্রকাশ করেন [২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়গনর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে একটি টাউন কমিটি গঠন করে মজিলপুর ও জয়নগর গ্রামের রাস্তাঘাট রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয়। এই টাউন কমিটিকে বাংলাদেশের একটি প্রাচীন-তম প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর মিউ-নিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তখন টাউন কমিটি উঠে যায়। আর জয়নগর থানা বারুইপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।[২৬]

চব্বিশ পরগণা জেলায় জৈনধর্মের প্রভাব সম্পর্কেও কালিদাস দত্ত আলোচনা করেন। তিনি সুন্দরবনের কয়েকটি লাটে তিনটি জৈনমূর্তি পান। জয়নগরের দক্ষিণে করঞ্জলি গ্রামে পুকুর কাটার সময় ছয়ফিট উচ্চ পার্শ্বনাথের একটি সুন্দর মূর্তি পাবার পর কালিদাস দত্ত লেখেন : "সেই মূর্তি কয়টির আবিষ্কারে বুঝা যায় যে, প্রাচীন-

কালে সুন্দরবনের ন্যায় বঙ্গদেশের সুদূর প্রদেশেও জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আমার মনে হয়, এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের খনন-কার্য চলিলে এই প্রদেশ হইতেও বঙ্গদেশের জৈন সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ অনেক পাওয়া যাইবে"।[২৮]

প্রাচীনকালে ভৌগোলিক ও শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলি সম্পর্কে কালিদাস দত্ত নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি গঙ্গানদীর প্রাচীন গতিপথ নির্ধারণ করেন। তাঁর মতে "অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটি ক্ষীণ প্রবাহ প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয়া 'টালির নালা' বা 'আদিগঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত ছিল, এবং তৎকালে কালী-ঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রসা নামক স্থানের পশ্চিম দিক দিয়া বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন সূর্যপুর, মুলটী, দক্ষিণ-বারাসত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত।"[২৯] তাঁর উক্তির স্বপক্ষে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণরাম রচিত রায়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এইসব গ্রন্থে ভাগীরথী নদীর প্রাচীন গতিপথ এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। তখন ভাগীরথীর উভয় তীরে বহু জনপদ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলা-চল গমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরেরা এই প্রবাহপথ ধরেই গিয়েছিলেন। বর্ত্তমানে ভাগীরথীর যে স্থান মজে গিয়ে 'মজাগঙ্গা' বা 'গঙ্গার বাদা' নামে পরিচিত তা গঙ্গানদীর অংশ মনে করে ওখানকার হিন্দুরা শবদাহ করেন এবং তাঁরা ওখা-কার পুকুরের জল গঙ্গাজল মনে করে ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণা গঙ্গা এখনও অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিখ্যাত স্মার্ত্ত

পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও তাই মনে করতেন এবং তিনি ওখানে শবদাহ করবার ও ওখানকার জল গঙ্গাজলরূপে ব্যবহারের বিধান দেন।[৩০] খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগীরথী নদী উপরে উল্লিখিত জনপদগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছত্রভোগ নামক স্থানের দক্ষিণ হতে বহু শাখা নদীতে বিভক্ত হয়ে 'গঙ্গার শতমুখ' নামে খ্যাত হয়। চৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে আছে মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে গঙ্গার শতমুখ দেখে আনন্দে নৃত্য করেন।[৩১] প্রচলিত প্রবাদ হল, এই নদীগুলির মধ্যে ঘিবাটী গাঙ্ বা ঘুঘুডাঙ্গা নদী ভাগীরথীর মূল প্রবাহের অংশ ছিল। ওম্যালি সাহেবের মতে "উহা কাকদ্বীপের নিম্নদিয়া বর্তমান সাগরদ্বীপের পূর্বে প্রবাহিত মড়িগঙ্গা নদীতে পড়িয়া সাগরদ্বীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিকস্থ নদীর খাড়ি দিয়া প্রথমে পশ্চিম মুখে ও পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়া ছিল এই জন্যই এখানে ধবলাটের পশ্চিম দিকস্থ নদীর মোহনায় প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেলা বসিয়া থাকে।"[৩২] প্রসঙ্গত কালিদাস দত্ত সেন আমলের পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির দক্ষিণভাগের পশ্চিম সীমা ও বৰ্দ্ধমান ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব্বসীমা নির্ধারণ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে স্থান নির্দেশ করেন তার সঙ্গে তিনি একমত হননি কালিদাস দত্ত বলেন : "শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিয়া, উক্ত বিভাগ দুইটির সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা গঙ্গা নদী নহে—অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। পূর্বে একটি ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে বর্তমান খিদিরপুরের নিকট আদিগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া, শাঁকরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর শাসন সময় ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরথীর জলরাশি

ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন। গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজও হিন্দুগণ উহার উপর শবদাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত খাল কোন সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, তাহা আজও জানা যায় নাই। ডি. ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল"।[৩৩] ননীগোপাল মজুমদার সঙ্কলিত Inscriptions of Bengal গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৯৬) গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত মহারাজা লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনের লিপি বিশ্লেষণ করে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন : "সেন রাজত্বকালে বর্দ্ধমান ভুক্তি পূর্বোলিখিত আদিগঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপি থানার সমগ্র অংশ ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর থানার কিয়দংশ, যাহা উক্ত গঙ্গানদীর পশ্চিমে অবস্থিত, বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন ছিল"।[৩৪] এই তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, মহারাজা লক্ষণ সেন বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই গ্রামের চতুঃসীমা রূপে যে সব স্থান উল্লেখ করা হয়েছে তা হল: উত্তরে ধর্মনগরী সীমা, পূর্বে জাহ্নবী অর্ধসীমা, দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা ও পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র সীমা। কালিদাস দত্তের ধারণা বারুইপুর রেল স্টেশনের নিকটে শাসন নামে যে একটি গ্রাম আছে তাই প্রাচীন কালের বেড্ডর শাসন গ্রাম। কারণ এই গ্রামের উত্তরে ধর্মনগর নামে একটি লোকালয় এবং পূর্বে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর শুষ্ক খাদ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।[৩৫] তিনি একটি মূল্যবান মানচিত্র সহযোগে তাঁর বক্তব্য বিষয় আলোচনা করেন। পরিশেষে কালিদাস দত্ত বলেন: "শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়, তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ী মণ্ডলের দক্ষিণাংশের পশ্চিমসীমা হুগলী নদী পর্যন্ত ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, পূর্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্ পর্যন্ত আদিগঙ্গা নদী ও তন্নিম্ন বর্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম সীমা ছিল এবং উহা চব্বিশ পরগণা জেলার ১ নম্বর হইতে ১৭ নম্বর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ নম্বর লাট বাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল''।[৩৬] গঙ্গানদী এই পথেই প্রবাহিত হত বলে প্রাচীনকাল হতে বহু জনপদ এই নদীর উভয় তীরে গড়ে ওঠে। গঙ্গা তীরে বাস করা হিন্দুদের কাছে পুণ্যজনক। উপরন্তু সামুদ্রিক বানিজ্যের একটি প্রধান পথও ছিল এই নদীর গতিধারা।[৩৭] এই সব তথ্য থেকেই এখানে প্রাচীনকালে বসতি স্থাপনের প্রকৃত কারণ অনুমান করা যায়। এই গতিপথ আলোচনায় তিনি ডি. ব্যারো, ফনডেন ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্র ব্যবহার করেন। কালিদাস দত্ত 'আদিগঙ্গা নদী' (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৯) নামক একটি প্রবন্ধেও এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

চব্বিশ পরগণার আদিম দেবতা ও লোকগাথা সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। নিম্নবঙ্গে আদিম দেবতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। 'বারা ঠাকুর' নামক একটি আদিম দেবতা নিয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।[৩৮] এই দেবতাটি আকারে দুইটি নরমুণ্ডের অনুরূপ। সাধারণত ১লা মাঘ অথবা মাঘ মাসের অন্য তারিখে প্রতি গ্রামে হিন্দুরা এই দেবতার পূজা করেন। এই দেবতাকে নিযে কোন প্রাচীন গাথা বা প্রবাদাদি না পাওয়ায় এই দেবতা কি শক্তির প্রতীক অথবা কি উদ্দেশে এর পূজা করা হয় তা বলা সম্ভব নয। কেউ কেউ এঁকে দক্ষিণ রায় নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কালিদাস দত্ত বলেন যে, দক্ষিণ রায় বারা ঠাকুর নন[৩৯] অন্যান্য দেশেও আদিম জাতিদের মধ্যে বারা ঠাকুরের মত মুণ্ডরূপী যুগ্ম দেবতার পূজার প্রচলন আছে। তামিল জাতির মধ্যেও এই ধরনের দেবতা পূজিত হয়। Whitehead রচিত The Village

Gods of South India গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইষ্টার দ্বীপেও এই ধরণের দেবতা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪০] বিভিন্ন দেশে মুণ্ডরূপী দেবতার পরিচয় পেয়ে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেন: "পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে গাজি সাহেব, ওলাবিবি ও বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদের সহিত দক্ষিণ রায়েরও আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি হইতে বোধ হয় যে দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য দেশের যুগ্ম মুণ্ডপূজক আদিম জাতিদের মত ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন মানবগণের দ্বারাই, মুসলমান আমলের বহু পূর্ব্বে, বারা ঠাকুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সকল মানব কাহারা ছিলেন এবং নিম্নবঙ্গের এই প্রদেশে কোন সময় তাহাদের আবির্ভাব ঘটে তাহাও অজ্ঞাত"।[৪১]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুর সম্পর্কেও কালিদাস দত্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি পঞ্চানন্দের গান নামে প্রচলিত প্রাচীন লোকগাথা প্রকাশ করেন।[৪২] এই অজ্ঞাত পরিচয় দেবতার পূজা এখানকার প্রতি গ্রামেই হয়। এই দেবতার পূজার সময় গায়েন নামক একশ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চা-নন্দের গান গেয়ে থাকেন। এক সময়ে পঞ্চানন্দ দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন এখনও এই দেবতার মূর্তির আদিমভাব বজায় আছে। দক্ষিণ ভারতের তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যেও এই ধরনের একটি দেবতা আছেন। এই সাদৃশ্য দেখে কালিদাস দত্ত বলেন: "দক্ষিণভারতের অনার্য্য দ্রাবিড়বংশোদ্ভব তামিল ও তেলেগু জাতির উপাস্য উক্ত লৌকিক দেবতাটির সহিত উল্লিখিত পঞ্চানন্দ বা বারা ঠাকুরের আকারের সাদৃশ্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গেও প্রাচীনকালে তামিল ও তেলেগু জাতির পূর্ব্বজনগণের অনুরূপ ধর্ম্মভাবাপন্ন আদিম মানবগণের বাস ছিল।"[৪৩] কালিদাস দত্ত রচিত 'নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা'

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৮, সচিত্র) নামক প্রবন্ধেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর রচিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এখানে দেওয়া হল: 'A Chandrasekhara Siva Image (J. I. S. of Oriental Art, 1941, Illustrated); 'বড়ডু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র; (প্রবাসী. চৈত্র ১৩৩৯ সচিত্র); 'প্রাচীন-যুগে পশ্চিম সুন্দরবন' (ঐ, শ্রাবণ ১৩৫৭); 'মজিলপুর (ঐ, আশ্বিন ১৩৫৮ সচিত্র); 'পশ্চিম সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্তি' (ঐ, আষাঢ় ১৩৫৯ সচিত্র); 'মজিলপুর, প্রাচীনকাল' (বন্ধু. শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৯ সচিত্র); 'মজিলপুর, আধুনিক কাল' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬১ সচিত্র); 'পশ্চিম সুন্দরবনের প্রত্ন সম্পদ' (বন্ধু, বৈশাখ, ১৩৬০), 'বড়ডুর ইতিবৃত্ত' (বন্ধু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০); 'ছত্রভোগ' (বন্ধু. শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০ সচিত্র); 'প্রাচীন স্থলপথ দ্বারির জাঙ্গাল' (বন্ধু, আষাঢ়, ১৩৬০); 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অতীত', (২৪ পরগণার ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির অধিবেশনে পঠিত ও প্রকাশিত. সচিত্র); 'বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র' (প্রবাসী. ভাদ্র ১৩৬৩, সচিত্র), 'পৌরাণিক গ্রন্থে চব্বিশ পরগণা' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭০); 'রায় মঙ্গল কাব্যে রাজা মদন রায়' (সংস্কৃতি); 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পর্তুগীজ' (ইতিহাস, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪)। 'বৈদিক ভারতে নরবলি' (সোমপ্রকাশ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা); 'একটি প্রাচীন গ্রাম দক্ষিণ বারাসত ও শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ' (চব্বিশ পরগণা); 'প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানব প্রসঙ্গ' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৭৫) ইত্যাদি প্রবন্ধও তথ্যসমৃদ্ধ।

কালিদাস দত্ত রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পূর্ণ তালিকা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। যে সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছি (তার মধ্যে কয়েকটির মাস ও বৎসর উল্লেখ নেই) তা ভিত্তি করেই

এই প্রবন্ধ রচিত। তাঁর সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন। তা না হলে অনেক দুর্লভ রচনা নষ্ট হয়ে যাবে। এই সব রচনায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও মনন শীলতার পরিচয় আছে তা পাঠকদের বিমুগ্ধ করবে। বাংলার ইতিহাস রচনায় এগুলো অমূল্য উপাদান রূপেই ব্যবহৃত হবে। ডঃ আনন্দ কুমার স্বামী, ডঃ ভোগেল, ডঃ টমাস, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতেরা কালিদাস দত্তের পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে উৎসাহিত করেন। কালিদাস দত্তের নিকট লিখিত পত্রে তার উল্লেখ আছে।[৪৪] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণে কালিদাস দত্তের অবদান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন: "বাঙলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে বাঙালার সমতল ভূমিকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্তিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পাল যুগের বহু গ্রাম নগর বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাঙলার সমতলভূমিকে আমরা যতটা নবীন বলিয়া মনে করিতেছি উহা ততটা নবীন নহে এবং ভূতত্ত্ববিদ-গণের মনে নবীন বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ তাহাকে উপেক্ষ করিতে পারেন না।"[৪৫] আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ সুন্দরবনের লুক্কায়িত সম্পদ প্রসঙ্গে বলেন, "To Sri Kalidas Datta, Scholarly Zamindar of Mazilpur, we are indebted of the present state of our knowledge about the antiquity of the Sundarban. The result of the archaeological research personally conducted by him in Sundarban, which have illumi-

nated a dark forgotten corner of Indian history, have been published in the Varendra Research Society's Monographs 3, 4 and 5 as also some other periodicals. Some remarkable example of Indian sculpture or the early and late medieval period collected by him are how preserved in the Asutosh Museum".[৪৬] ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কালিদাস দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর সংগ্রহশালা দেখে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর অবদান উল্লেখ করে লেখেন : "For more than 70 years he has lived in the building in the 24 Parganas, which canfittingly lay claim to its association with Bengal s cultural advance, and has spent half his life time constructing the historical background of South-West Bengal. Much of the history of the Southern areas of this district is still concealed and dedicated service is needed to collect material. study specimens and interpret them correctly"[৪৭]

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিউজিয়াম গঠনে উদ্যোগী হন। তখন কালিদাস দত্ত বহু মূল্যবান পুরাবস্তু এই মিউজিয়ামে দান করেন। তা ছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান (ন্যাশনাল) মিউজিয়াম ও সংস্কৃত কলেজ সংগ্রহশালায় কয়েকটি দুর্লভ জিনিষ দান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেও তাঁর সংগ্রহশালায় প্রাচীনকালের অনেক দুর্লভ জিনিষ ছিল। কালিদাস দত্তের পরলোক গমনের পর তাঁর দুই পুত্র ডঃ বিমল কুমার দত্ত ও শ্রীঅনিল কুমার দত্ত তাঁর সংগ্রহশালায় রক্ষিত সমস্ত পুরাবস্তু, যার আনুমানিক মূল্য হবে

৫০,০০০ টাকা বা তারও বেশী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারিতে দান করেন।[৪৮] এই পুরাবস্তুসমূহ 'কালিদাস দত্ত সংগ্রহ, নামে পৃথকভাবে রক্ষিত আছে। কালিদাস দত্ত পুরাবস্তুসমূহ সংগ্রহ করে যেখানে রেখেছিলেন সেইখানেই বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন। এই বাড়ীতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা পরিসমাপ্ত করেন এবং 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেন।[৪৯]

কালিদাস দত্তের বাসনা ছিল যে, একটি আঞ্চলিক প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারি তৈরী করে গবেষকদের চব্বিশ পরগণার অতীত ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবেন অর্ধশতাব্দী ধরে এই সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। রামদাস বাবাজীর শিষ্যের কাছ থেকে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। আচার-সর্বস্ব ধর্মকে পরিহার করে আজীবন তিনি যুক্তি নিষ্ঠ মনকে সযত্নে লালন করেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কালিদাস দত্ত বহু মানসিক ঘাত প্রতিঘাতে বিব্রত থাকলেও এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যধিতে কষ্ট পেলেও ইতিহাস চর্চা থেকে বিরত হননি। খুবই বেদনার কথা, যিনি দীর্ঘকাল ধরে একনিষ্ঠ সাধকের মত নিম্নবঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করেছেন, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছেও সুপরিচিত নন। এই আত্ম-বিস্মরণ কবে আমরা কাটিয়ে উঠব?

সূত্র নির্দেশ

১ The Statesman, June 24, 1966, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, 'প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত', বসুমতী (রবিবারের সাময়িকী), ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮।

২ ঐ।

৩ Kalidas Datta, "The Antiquities of Khari", Varendra Research Society, Appendices to Annual Report for 1928-29 (Monograph No. 3) Rajshahi, April 1929, pp. 1-13 ;
Kalidas Datta, 'The Antiquities of the North-Weat Sundarban Ibid, No. 4 .
Kalidas Datta. 'The Antiquities of Sundarban', Ibid, No. 5.
৪ Ibid.
৫ পশ্চিমবঙ্গ (সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত, ২১শে জুন ১৯৫১, পৃঃ ৬২০ ।
৬ Kalidas Datta, 'Some Primitive Antiquities from the Sundarbans', Science and Culture, Vol. 27, June 1939.
৭ Kalidas Datta, 'Some Early Archaeological Finds of the Sundarban', The Modern Review, July 1939, pp. 39-44.
৮ কালিদাস দত্ত, 'জটার দেউল', শারদীয় গ্রামের দাবী, ১৩৬৪ সাল, (সচিত্র) পৃঃ ২-৪ ।
৯ ঐ ।
১০ ঐ ।
১১ Kalidas Datta, 'The Saura Images from the District of 24 Parganas ; The Indian Historical Quarterly, Vol. IX, Calcutta, 1933, pp. 202-207.
১২ কালিদাস দত্ত, 'খাড়ী', বন্ধু (শারদীয় সংখ্যা) পৃ ৫-৬ ।
১৩ ঐ ।
১৪ ঐ ।
১৫ ঐ ।
১৬ ঐ ।
১৭ কালিদাস দত্ত, 'সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসত', ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৪, সচিত্র, পৃ ২০০-২০৩ ।
১৮ ঐ ।
১৯ ঐ ।
২০ ঐ ।

২১ কালিদাস দত্ত, 'জয়নগর', প্রজ্ঞা, তৃতীয় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ পৃ ৮-১৬।

২২ ঐ, পৃ ১৩।

২৩ ঐ, পৃ ১৪। জয়নগর থেকে খাড়ীর দূরত্ব আট মাইল।

২৪ ঐ, পৃ ১৫।

২৫ ঐ, পৃ ১৫-১৬।

২৬ ঐ, পৃ ৮।

২৭ The Statesman, July 24, 1939.

২৮ কালিদাস দত্ত, সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈনমূর্তি, পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩৩৯ (সচিত্র)

২৯ কালিদাস দত্ত, 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৪১, পৃ ১৯-২০।

৩০ ঐ, পৃ ২০।

৩১ ঐ।

৩২ ঐ, পৃ ২১-২২।

৩৩ ঐ, পৃ ১৯।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগলিক বিভাগ' নামক প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি ও বর্দ্ধমান ভুক্তির সীমা নির্ধারণ করেন। এই অঞ্চল সম্পর্কে যোগেশ চন্দ্র রায় রচিত 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' নামক প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত সুরেশ চন্দ্র দত্ত রচিত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের ভু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' এই বিষয়ে আলোকপাত করে। কালিদাস দত্ত এই তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেন।

৩৪ ঐ, পৃ ২২।

৩৫ ঐ।

৩৬ ঐ, পৃ ২২-২৩।

৩৭ কালিদাস দত্ত, 'জয়নগর', প্রজ্ঞা, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ৯।

৩৮ কালিদাস দত্ত, 'বারা ঠাকুর', ভারতীয় লোকযান, পৃ ২৫-৩২।

৩৯ ঐ, পৃ ২৮।

৪০ ঐ, পৃ ৩১।

৪১ ঐ, পৃ ৩২।

৪২ কালিদাস দত্ত, 'পঞ্চানন্দের গান', সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৬৩ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃ ৮১-৯১।

৪৩ ঐ, পৃ ৮২।

৪৪ সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ, 'বাঙলার প্রত্নতাত্ত্বিক', দৈনিক বসুমতী, ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯২০।

৪৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই পৌষ ১৩৩৪।

৪৬ 'Hidden Treasures of Sundarban, Amrita Bazar Patrika, October 2. 1953.

৪৭ The Statesman, June 24, 1939.

৪৮ সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ, ২১শে জুন ১৯২০, পৃ ৬২০।

৪৯ The Statesman, June 24, 1953.